আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গোলা

কবীর ঔর জ্ঞান সব জ্ঞানড়ী, কবীর জ্ঞান সো জ্ঞান। জৈসে গোলা তোব কা, করতা চলে মৈদান॥

অর্থাৎ, যেমনটি বেদের মধ্যে প্রমান আছে যে, পরমাত্মা পৃথিবীতে প্রকট হয়ে যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান স্বয়ং নিজের মুখে বলা বাণীর মাধ্যমে বলেন, যেটাকে সূক্ষ্মবেদ অথবা তত্ত্বজ্ঞান বলা হয়। কবীর জোলাই, হলেন পূর্ণ পরমাত্মা। উনি যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিজের কবীর বাণীর মাধ্যমে নিজমুখে উচ্চারন করে শুনিয়েছেন, সেটা হল সূক্ষ্মবেদ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান। সেটা হল সম্পূর্ণ সত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান। সেটার সামনে অন্য কোনো জ্ঞান যেমন চার বেদ (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ) আঠারোটি পুরান, এগারোটি উপনিষদ, গীতা, কোরান, বাইবেলের (তৌরেত, জবুর, ইন্জিল এই তিনটি গ্রন্থের জ্ঞানও বাইবেলের মধ্যে রয়েছে) জ্ঞান অসম্পূর্ণ বা নগন্য দেখায়। যা দিয়ে ভ্রম বা সন্দেহ মেটানো যায় না। কিন্তু কবীর সাহেবের জ্ঞান কামান অস্ত্রের গোলার মতো, যেটা অজ্ঞান রুপী দুর্গকে ধুলিস্যাৎ করে ময়দান বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বোঝার পরে সাধক, শ্রদ্ধালু ভক্তজনদের মনে আর কোন ভ্রম বা সন্দেহ থাকে না। তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজ এই কবীর পরমাত্মার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গোলার মাধ্যমে সমস্ত ধর্মগুরু এবং প্রচারকদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ অর্থাৎ নগন্য প্রমানিত করে যথার্থ জ্ঞানটা বলেছেন, আর গবেষণা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কাশী শহরে যে কবীর জোলা থাকতেন তিনিই হলেন পূর্ণ প্রভু, সমগ্র সৃষ্টির রচনাকার তথা পালনকর্তা। এরপর পড়ুন সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ-

তত্ত্বদর্শী সন্ত রামপালজী মহারাজ দ্বারা কৃত আধ্যাত্মিক আবিষ্কার = কবীর জোলাই হলেন পূর্ণ পরমাত্মা।

(Spiritual Discovery = Kabir, the weaver, is complete GOD by Tattwadarshi Sant Rampalji Maharaj)

শ্রী কৃষ্ণজী ওরফে শ্রী বিষ্ণুজী, যাঁকে সত্ত্বগুন বলা হয়, তিনি শুধুমাত্র তিন লোকের (স্বর্গ, মর্ত এবং পাতালের) অন্তর্গত একটি সত্ত্বগুন বিভাগের প্রভু। একটি ব্রহ্মাণ্ডের ১৪ টি লোক বা ভুবন রয়েছে। এগুলির থেকে আলাদা ব্রহ্মলোকও রয়েছে। এইরকম আরো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে।

- ❖ পরমেশ্বর কবীর সাহেব হলেন এই সব অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, সমস্ত আত্মা এবং সর্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিকর্তা, সবার ধারন পোষন কর্তা, সমগ্র কুলের (সমষ্টিগত) মালিক অর্থাৎ বাসুদেব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (গীতার) ৩ নং অধ্যায়ের ১৫ নং শ্লোকে যাঁকে সর্বগতম্ ব্রহ্ম বলা হয়েছে, ওটা কবীর সাহেবের বিষয়েই বলা হয়েছে। যেমন গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ২৯ নং শ্লোকে গীতার জ্ঞানদাতা ভগবান কাল বা ব্রহ্ম (লোকবেদের অর্থাৎ প্রচলিত জনশ্রুতি/ লোককথা/গালগল্প বা পৌরাণিক কাহিনীর আধারে শ্রীকৃষ্ণকে গীতার জ্ঞানদাতা ভগবান বলে ধরে নেওয়া হয়) "তত্ ব্রহ্ম"-র বর্ণনা করেছেন। সেইজন্য অর্জুন গীতার ৮ নং অধ্যায়ের ১ নং শ্লোকে প্রশ্ন করেছেন যে "তত্ ব্রহ্ম" টা কি? সেই প্রশ্নের উত্তর, গীতার জ্ঞানদাতা, ৮ নং অধ্যায়ের ৩, ৮, ৯, ১০ নং আর ২০-২২ নং শ্লোকে, গীতার ১৫ নং অধ্যায়ের ১-৪ নং এবং ১৬-১৭ নং শ্লোকে, দিয়ে দিয়েছেন।
- ❖ গীতার ৮ নং অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকে পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, উনি হলেন পরম অক্ষর ব্রহ্ম। ৮ নং অধ্যায়ের ৫, ৭ নং শ্লোকে বলেছেন যে, আমার ভক্তি করো, তাহলে তোমার আমাকে প্রাপ্তি হয়ে যাবে।
- ❖ গীতার ৮ নং অধ্যায়ের ৮, ৯, ১০ নং শ্লোকে বলেছেন, যাঁরা ওই পরম অক্ষর ব্রহ্মের, যিনি

হলেন আমার থেকে অন্য (অপর কেউ), সেই পরম দিব্য পুরুষের ভক্তি করেন, তাঁদের ওই দিব্য পুরুষের প্রাপ্তি হয়ে যায়, ২০-২২ নং শ্লোকেও যাঁকে বাস্তবে অবিনাশী বলা হয়েছে। যিনি সর্ব প্রাণী নস্ট হয়ে যাওয়ার পরেও নষ্ট হন না। তিনি কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই লভ্য বা প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য।

- ❖ গীতার বক্তা (ভগবান কাল ব্রহ্ম) গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ২৪, ২৫ নং শ্লোকে নিজেকে অব্যক্ত (প্রথম অব্যক্ত) বলেছেন। এই অব্যক্ত পুরুষকেই গীতার ১৫ নং অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোকে ক্ষর পুরুষ বলে অভিহিত করেছেন।
- ❖ আর গীতার ৮ নং অধ্যায়ের ১৮-১৯ নং শ্লোকে যাকে অব্যক্ত (দ্বিতীয় অব্যক্ত) বলা হয়েছে তাকেই ১৫ নং অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোকে অক্ষর পুরুষ বলা হয়েছে। আর এই দুইজন-ক্ষর পুরুষ আর অক্ষর পুরুষ, আর এনাদের অন্তর্গত সমস্ত প্রানীদের এবং এনাদের সর্বলোককে নাশবান বলা হয়েছে।
- ❖ গীতার ৮ নং অধ্যায়ের ২০, ২২ নং শ্লোকে যাকে অব্যক্ত (তৃতীয় অব্যক্ত) বলা হয়েছে তিনি হলেন অন্য অব্যক্ত পুরুষ অর্থাৎ গীতার ৮ নং অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকে বলা পরম অক্ষর ব্রহ্ম, এনাদের থেকে (আগে উল্লেখিত) অপর কোনো পুরুষ। উনি সমস্ত জগত নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও কখনো নষ্ট হন না। উনিই হলেন কবীর পরমেশ্বর। উনিই হলেন বাস্তবে অবিনশ্বর পুরুষ।
- ❖ গীতার ১৫ নং অধ্যায়ের শ্লোক নং ১৭ তে বলেছেন :- (উত্তম পুরুষঃ) শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম, তো হলেন গীতার ১৫ নং অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোকে বলা ক্ষর পুরুষ (গীতার জ্ঞান দাতা) আর ৮ নং অধ্যায়ের ১৮, ১৯ নং শ্লোকে বলা অক্ষর পুরুষ, এই দুইজনের থেকে (তু) তো (অন্যঃ) অন্য অর্থাৎ অপর কেউই। যাঁকে (পরমাত্মা) পরমাত্মা (ইতি) এইরূপ (উদাহৃতঃ) বলা হয়েছে। (য়ঃ) যিনি (লোকত্রয়ম্) তিন লোকে (আবিশ্য) প্রবেশ করে (বিভর্তি) সবাইকে ধারন পোষন করেন, তিনি হলেন (অব্যয়ঃ) অবিনশ্বর (ইশ্বরঃ) পরম প্রভু।

সারাংশ :- গীতা জ্ঞান দাতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আসলে সবার ধারন পোষণকারী ওই অবিনশ্বর পরম পুরুষ তো আমার থেকে অন্য কেউ, উনিই হলেন আসল পুরুষোত্তম। গীতা জ্ঞান দাতা গীতার ১৫ নং অধ্যায়ের ১৮ নং শ্লোকে নিজের বিষয়ে বলেছেন যে, আমার ক্ষেত্রের (ক্ষর পুরুষের ২১ টি ব্রহ্মাণ্ডে) নাশবান জড় বর্গ আর অবিনাশী জীবাত্মা সমূহের থেকে আমি উত্তম। এই জন্য লোক বেদের আধারে, মানে লোক মুখে শোনা জনশ্রুতির (লোককথা বা গল্পকথার বা পৌরাণিক কাহিনীর) ভিত্তিতে আমি পুরুষোত্তম্ হিসাবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছি।

গীতা জ্ঞান দাতা (পৌরাণিক মতে শ্রী কৃষ্ণ ওর্ফে শ্রী বিষ্ণু, কিন্তু আসলে গীতার জ্ঞান দাতা হলেন প্রভু কাল ব্রহ্ম যিনি হলেন শ্রী বিষ্ণুজীর পিতা) নিজের স্থিতি একদম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যেমন :- গীতায় ৪ নং অধ্যায়ের ৫ এর শ্লোকে বলেছেন যে, হে অর্জুন! তোমার এবং আমার অনেক অনেক জন্ম হয়ে গেছে। ২ নং অধ্যায়ের ১২ নং শ্লোকে বলেছেন যে, আমি, তুমি এবং এই সমস্ত রাজা গণ আগেও জন্ম নিয়েছিল, বর্তমানেও জন্ম নিয়েছে, এবং এমন নয় যে আমরা পরে আর জন্ম গ্রহন করব না। অর্থাৎ আমাদের জন্ম-মৃত্যু তো হতেই থাকবে। ১০ নং অধ্যায়ের ২ নং শ্লোকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আমার উৎপত্তি তো হয়েছে, কিন্তু আমার উৎপত্তির বিষয়ে এই দেবতা ও ঋষিগন জানেন না।

গীতাজ্ঞান দাতা নিজের থেকে আলাদা, অবিনাশী, তিন লোকের ধারণ পোষন কারী, পরম অক্ষর

ব্রহ্মের কথা তো উপরে বলে দিয়েছেন, যিনি হলেন বাস্তবে অবিনাশী এবং পুরুষোত্তম্, সমস্ত জগতের মালিক।

গীতার জ্ঞান দাতা ১৮ নং অধ্যায়ের ৬২ এবং ৬৪ নং শ্লোকে সেই প্রভুর শরণে যেতে বলেছেন। ওই পরম পুরুষের কৃপায় পরম শান্তি তথা সনাতন পরম ধাম প্রাপ্তি হবে বলা হয়েছে। ওনারই বর্ণনা দিতে গিয়ে গীতায় ১৫ নং অধ্যায়ের ১-৪ নং শ্লোকে বলেছেন যে, সংসার রূপী অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল (পরমাত্মা, পরম অক্ষর ব্রহ্ম) তো উপরে আছেন যিনি হলেন পরম অক্ষর ব্রহ্ম। তিন গুন (রজ গুন ব্রহ্মা, সত্ত্ব গুন বিষ্ণু ও তম গুন শিব) তো সংসার রূপী বৃক্ষের শাখা। যে সন্ত সংসার রূপী বৃক্ষের সর্ব বিভাগের বিবরন পৃথক-পৃথক ভাবে বলে দেবেন, (সঃ বেদ বিদ্) তিনি বেদের তাৎপর্যটাকে সঠিকভাবে জানেন অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী সন্ত। এই তত্ত্বদর্শী সন্তের বিষয়ে গীতার ৪ নং অধ্যায়ের ৩২ এবং ৩৪ নং শ্লোকে বলেছেন যে, ওই পরম অক্ষর ব্রহ্মের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এবং পরিচয়, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ (ব্রহ্মণঃ মুখে) ওই সচ্চিদানন্দ ঘন ব্রহ্মই স্বয়ং নিজের মুখ কমলে উচ্চারন করে বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। ওই জ্ঞানটা তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে প্রাপ্ত করো। কবীর পরমেশ্বরজী এই পৃথিবীতে সশরীরে প্রকট হয়ে যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিজের কবির বাণী (বেদে বলা হয়েছে কবির্গীর্ভি:) দ্বারা মুখ কমলে উচ্চারণ করে বলেছেন।

কবীর অক্ষর পুরুষ এক পেড় হ্যাঁয়, ক্ষর পুরুষ বাকী ডার। তিনো দেবা শাখা হ্যাঁয়, পাত রূপী সংসার॥

কবীর হাম হী অলখ আল্লাহ হ্যাঁয় মূল রূপ সংসার। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড কা ম্যাঁয় হী সরিজন হার। অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর এই বাণীতে গীতার ১৫ নং অধ্যায়কে এই উপরোক্ত দুটি দোঁহাতে বলে দিয়েছেন। বলেছেন যে, সংসার রূপী একটি বৃক্ষ রয়েছে। এই বৃক্ষের মূল (root) তো হলাম আমি অর্থাৎ পরম অক্ষর পুরুষ (কবীর দেব)। আর কান্ডটি হল অক্ষর পুরুষ। আর ওই কান্ড থেকে অনেক মোটা ডাল বের হয়েছে। তার মধ্যে একটি ডাল হল ক্ষর পুরুষ, ওই মোটা ডালে যুক্ত তিনটি শাখাকে যথাক্রমে রজগুন ব্রহ্মা, সত্ত্ব গুন বিষ্ণু, তম গুন শিব বলে জানো। ওই শাখায় লেগে থাকা পাতাগুলোকে সংসারের সমস্ত প্রাণী বলে জানো।

দেখুন সংসার রূপী বৃক্ষের চিত্র :-

গীতার ১৫ নং অধ্যায়ের ১৭ নং শ্লোকে এটা স্পষ্ট করা হয়েছে যে সমস্ত জগতের ধারন পোষন কারী অবিনাশী পরমাত্মা তো ১৬ নং শ্লোকে বলা ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ থেকে অন্য কোনজন কেউ রয়েছেন। তিনিই সবার ধারণ-পোষণ করেন। তিনিই পরম পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। এর থেকে প্রমানিত হল যে, গীতা জ্ঞান দাতা, যিনি হলেন কাল ব্রহ্ম (লোক বেদ বা পৌরানিক কথা অনুসারে শ্রী কৃষ্ণজী ওরফে শ্রী বিষ্ণুজী) আর তার থেকে অন্য কেউ পূর্ণ পরমাত্মা রয়েছেন।

কবীর পরমেশ্বরজী নিজের স্থিতি এই প্রকারের জানিয়েছেন :-

কবীর, অবধু অবিগত সে চল আয়া, মেরা ভেদ মরম না পায়া।
না মেরা জন্ম না গর্ভ বসেরা বালক বন দিখলায়া। কাশী শহর জল কমল পর ডেরা তহাঁ জুলাহ নে পায়া॥
মাতা- পিতা মেরে কছু নাহি, না মেরে ঘর দাসী। জুলাহা কা সুত আন কহায়া, জগৎ করে মেরী হাঁসি॥
পাঁচ তত্ত্ব কা ধড় নহীঁ মেরে জানুঁ জ্ঞান অপারা। সত্ স্বরূপী নাম সাহেব কা ওহি নাম হমারা॥
অধর দ্বীপ গগন গুহা মেঁ তহাঁ নিজ বস্তু হমারা। তেরা জ্যোতি স্বরূপী অলখ নিরঞ্জন ধরতা ধ্যান হমারা॥
হাড় চাম লহু না মেরে কোই জানে সতনাম উপাসী। তারণ তরণ অভয় পদ দাতা ম্যাঁয় হুঁ কবীর অবিনাশী।

ভাবার্থ :- পরমেশ্বর কবীর সাহেবজী নিজের বিষয়ে স্ববৃত্তান্ত নিজেই বলেছেন। এক সময় গোরখনাথজী যিনি "অলখ নিরঞ্জন" ধ্বনি লাগাতেন (এই বলে হাঁক দিতেন) আর তম গুন শিবের উপাসক ছিলেন, তিনি কবীর সাহেবের সঙ্গে জ্ঞান চর্চা করেছিলেন। আর তাতে তিনি হেরে গিয়েছিলেন। তারপর সিদ্ধির জাল বিছিয়ে দেন। তাতেও কবীর সাহেবের কাছে হেরে যান। তখন শ্রী গোরখ নাথ মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন যে, আজ পর্যন্ত আমার সাথে টক্কর দেওয়ার কেউ ছিল না, আপনি কোথা থেকে চলে এলেন? কবীর সাহেব শ্রী গোরখ নাথ মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর বাণীর মাধ্যমে দিয়েছেন। বলছেন যে, হে অবধুত! (গোরখনাথজী শুধু একটা ল্যাঙট বা কৌপিন কটিবস্ত্র রূপে বাঁধতেন। এই রূপ বেশভুষার সন্তকে অবধূত বলা হয়। কবীর সাহেব ভালোবেসে "অবধু" বলে সম্বোধিত করেন)। আমি অবিগত স্থান অর্থাৎ যার রহস্য আমি ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয় বা জানে না, ওই জায়গার গতি আর স্থিতির ব্যাপারে কেউ জানে না শুধু আমি জানি, সেই স্থান থেকে স্বশরীরে চলে এসেছি। কাশী শহরের এক সরোবরে, কমল (পদ্মফুল) ফুলের উপরে বালক রূপ ধারন করে বিরাজমান হয়ে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে নীরু নামক জোলা আমাকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এই জন্য সবাই আমাকে জোলার ছেলে বলতে শুরু করে দিলেন। উচ্চবর্ণের লোকেরা আমাকে জোলা বলে উপহাস করেন। আমার বলা জ্ঞানকে কোন গুরুত্ব দেন না। আমার কখনো জন্ম হয়নি। আমি কোন মায়ের গর্ভে থাকিনি। আমার কোন মাতা-পিতা বা স্ত্রী (দাসী) নেই, আমার শরীর পাঁচ তত্ত্বের নয়। এই শরীর কেবল একটি নূর তত্ত্ব দিয়ে তৈরী। পরমেশ্বর কবীর সাহেব বিদেহি অর্থাৎ সকলের থেকে পৃথক অলৌকিক শরীর যুক্ত। পরমেশ্বর কবীর সাহেব বলেছেন যে, অধর অর্থাৎ উপরের আকাশে একটি ভওঁর গুফা আছে। ওটা আমার লোকে যাওয়ার মার্গ। ওখানে একটা বিশেষ ধ্বনি নিরন্তর হতে থাকে। হে গোরখ নাথ! আপনার অলখ নিরঞ্জন অর্থাৎ ক্ষর ব্রহ্মও আমারই পুজা করেন।

প্রমান :- গীতা জ্ঞান দাতা ক্ষর ব্রহ্ম ১৮ নং অধ্যায়ের ৬৪ নং শ্লোকে বলছেন যে ওই পরমেশ্বর, (যাঁর শরনে যাওয়ার জন্য ১৮ নং অধ্যায়ের ৬২ নং শ্লোকে আগেই বলা হয়েছে) উনিই হলেন আমার ইষ্ট দেব অর্থাৎ আমিও হলাম ওনারই ভক্ত।

যেমন বেদে কবীর্দেব, কুরানে আল্লাহ কবীর ইত্যাদি যথার্থ নাম পরমাত্মার বলে মানা হয়। কবীর সাহেব বলেছেন পরমাত্মার যে আসল নাম আছে সেই কবীর হলো আমার নিজের প্রকৃত নাম।

আমি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান জানি। আমার বিষয়ে সঠিক তথ্য কোন সতনাম অর্থাৎ সত্য ভক্তির মন্ত্র জপ স্মরন করা ভক্তই জানেন। আমি জীবকে পূর্ণ মুক্তি প্রদান করে নির্ভয় করে দিই। আমিই হলাম সেই অবিনাশী কবীর।

সারাংশ :- এই বিবরন থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, কাল ব্রহ্ম (লোক বেদ মতে শ্রীকৃষ্ণজী) গীতা জ্ঞানে নিজেকে নশ্বর বলেছেন। আর পরমাত্মা কবীর সাহেব নিজেকে অবিনশ্বর বলেছেন।

কবীর সাহেব বলেছেন যে :–

কবীর, বেদ মেরা ভেদ হ্যায়, ম্যাঁয় না বেদন কে মাহী। জোন বেদ সে ম্যাঁয় মিলুঁ, চার বেদ জানতে নাঁহি।

ভাবার্থ :- পূর্ণ পরমাত্মা কবীর পরমেশ্বরজী বলেছেন যে চার বেদ আমারই মহিমা গান দ্বারা পূর্ণ করা রয়েছে। কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত করার বিধি এই চার বেদে (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ) নাই। এক মাত্র সুক্ষ্ম বেদে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানটিতে আমাকে প্রাপ্ত করার বিধি বর্ণিত আছে। এই জ্ঞান বেদের জ্ঞান থেকে পৃথক জ্ঞান।

প্রমানের জন্য বেদের কিছু মন্ত্র উপস্থাপন করা হল :-

যেমনটি পরমেশ্বর কবীর সাহেব উপরোক্ত বাণীতে স্বয়ং বলেছেন যে আমি উপরের লোক থেকে চলতে শুরু করে পৃথিবীতে এসেছি। আমার এই রহস্যকে কেউ জানেন না। সন্ত গরীব দাসজী বলেছেন যেঃ-

গরীব, অজব নগর মেঁ লে গয়া মুঝকো সত্গুরু আন। ঝিলকে বিম্ব অগাধ গতি সুতে চাদর তান।

অর্থাৎ গরীব দাস মহারাজজী বলেছেন যে সতগুরু কবীর সাহেব উপরের লোক থেকে চলা শুরু করে, পৃথিবীতে এসে, আমাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে, উপরে এক অদ্ভুত আজব নগরে অর্থাৎ লোকে নিয়ে যান। এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছি যে, সত্ ভক্তি করে মৃত্যুর পর, পরম সুখ দায়ী, সুখসাগর সতলোকে চলে যাব।

বেদ গ্রন্থও এই একই কথা বলেছে যে, পরমাত্মা উপরের লোকে বিরাজমান আছেন। ওখান থেকে চলা শুরু করে তিনি পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ পূণ্য আত্মাদের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের জ্ঞান উপদেশ দেন। যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান তিনি নিজের মুখে উচ্চারিত বাণীর মাধ্যমে বলেন, সেই জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান (সুক্ষ্মবেদ) বলা হয়।

প্রমাণ :- ঋগ্বেদের ৯ নং মন্ডলের ৫৪ নং সূক্তের ৩ নং মন্ত্র :–

অয়ম্ বিশ্বানি তিষ্ঠন্তি পুনানোঁ ভুবনোপরি সোমঃ বেদঃ ন সূর্যঃ।

অর্থাৎ যেমন সূর্য উপরে, আকাশে থেকে সবাইকে প্রকাশ ও উষ্ণতা প্রদান করে। তদ্রুপ ওই অমর পরমেশ্বর সবাইকে পবিত্র করতে থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরের ভাগে (তিষ্ঠন্তি) বিরাজমান থাকেন। অর্থাৎ এক জায়গায় বসে আছেন (তিনি একদেশীয়)।

ঋগ্বেদের ৯ নং মন্ডলের ৮৬ নং সুক্তের ২৬ নং মন্ত্র –

ইন্দুঃ পুনানঃ অতি গাহতে মৃয়ঃ বিশ্বানি কৃণ্বন সুপথানি য়জ্যবে।
গাঃ কৃণ্বানঃ নির্জিনম্ হর্য়ত্ কবির্ অত্যো ক্রীলন্ পরি বারম্ অর্য়তি॥ (২৬)

অর্থাৎ যজ্ঞ মানে ধার্মিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ পুজা (পরমাত্মার নিজমুখে বিস্তারিত ভাবে বলা ধার্মিক অনুষ্ঠান বা যজ্ঞ) করা ভক্তদের জন্য পরমাত্মা সমস্ত রাস্তা সুগম করতে থেকে, তাদের সর্ব কষ্ট মিটিয়ে দেন এবং সাধকের পাপ নাশ করে শুদ্ধ করেন। নিজের তেজোময় রূপকে সহজ সরল করে, হাল্কা প্রকাশ যুক্ত করে কবীর্দেব অর্থাৎ কবীর পরমাত্মা বিদ্যুৎ মানে আকাশের বজ্রের মতো তীব্র গতিতে চলমান হয়ে আসেন। আকাশের বিদ্যুতের মত খেলা করে শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্থাৎ সৎ আত্মাদের, ভক্তদের সাথে দেখা করেন। তিনি হলেন পরমাত্মা কবীর অর্থাৎ কবীর্দেব।

ঋগ্বেদের ৯ নং মন্ডলের ৮২ নং সুক্তের ১ নং মন্ত্র :

অসাবি সোমঃ অরুষঃ বৃষা হরিঃ রাজেব দস্মঃ অভি গা অচিক্রদত্।
পুনানঃ বারম্ পর্য়েতি অব্যয়ম্ শ্যেনঃ যোনি ঘৃতবন্তম্ আসদম্॥ (১)

অর্থাৎ যিনি সকলের উৎপত্তিকারী, তেজোময় শরীরযুক্ত পরমেশ্বর, যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং সুখ বর্ষনকারী, পাপরাশির বিনাশকর্তা, তিনি (রাজেব) রাজার সমান (দস্মঃ) দর্শনীয় অর্থাৎ ওই পূর্ণ পরমাত্মা উপরে নিজের লোকরূপী রাজধানীতে সিংহাসনের উপর বিরাজমান আছেন। তাঁর দৃশ্যরূপ (মুখচ্ছবি)

রাজার মতো দেখতে। ওই পরমেশ্বর ওখান থেকে গতিশীল হয়ে এই পৃথিবী ইত্যাদি লোক-লোকান্তরে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেওয়ার জন্য আসেন। ওনার অমৃত বাণী ওই সব জায়গায় প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে, তিনি (বারম্) বরনীয় পুরুষদের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, যাঁরা দৃঢ় ভক্ত হন, তাদেরকে নিজের অমৃত বাণীর মাধ্যমে এবং আশীবার্দ দিয়ে পবিত্র করে নিয়ে প্রাপ্ত হন। যেমন (শ্যেনঃ) আকাশের বিদ্যুৎ, সুপরিবাহী স্থানকে আধার করে প্রাপ্ত হয়। তদ্রুপ পরমেশ্বরও নিজের প্রিয় পাত্রদের প্রাপ্ত হন।

ভাবার্থ :- পরমাত্মা সব থেকে উপরের লোক সতলোকে, সিংহাসনের উপর, এক সম্রাটের সমান, মাথায় মুকুট আর মাথার উপরে ছত্র ধারন করে, এক গম্বুজ যুক্ত মহলে বসে আছেন। পরমাত্মা রাজার মতো দেখতে, নর অর্থাৎ তাঁর শরীর মানুষের মতো আকার যুক্ত।

যেমন আকাশের বিদ্যুৎ সেই ধাতুর উপরে পড়ে যেটা তাকে আকর্ষন করে। একই ভাবে পরমাত্মাও নিজের রাজধানী থেকে চলা শুরু করে পৃথিবী ইত্যাদি লোকে আসেন। যারা দৃঢ় ভক্ত, তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, সেই উৎকৃষ্ট সৎ আত্মাদের প্রাপ্ত হয়ে যান। তাদের যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেন। কবীর সাহেবজী নিজের যে সব দৃঢ় ভক্তদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁদের নামগুলি নিম্নরূপ :-

১. শেঠ ধর্মদাসজী, গ্রাম - বান্ধবগড় (মধ্য প্রদেশ); ২. শ্রী নানক দেবজী, শিখ ধর্মের প্রবর্তক; ৩. শ্রী দাদু দাসজী; ৪. শ্রী গরীব দাসজী, গ্রাম-ছুড়ানী, জেলা-ঝজ্জর, হরিয়ানা; ৫. শ্রী মুলক দাসজী; ৬. শ্রী ঘীসা দাসজী, গ্রাম - খেখড়া, জেলা - বাগপথ, উত্তর প্রদেশ।

বিশ্লেষণ :- চার বেদ (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ) পরমাত্মার পরিচয় দেয়। পরমাত্মা কেমন? কেমন করে, কি লীলা করেন? কোথায় থাকেন? তাকে প্রাপ্ত করার বিধি বা সাধনা কোনটা? চার বেদকে হিন্দুধর্মের মানে সনাতন ধর্মপন্থী লোকেরা সতবিদ্যার (সত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের) স্রোত বলে মানেন। উপরোক্ত এবং পরে যে বেদমন্ত্র গুলি বলা হবে তাতে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে পরমাত্মা এই রকম লীলা করেন। বেদে বর্ণীত পরমাত্মার লক্ষনগুলি কেবলমাত্র পরমেশ্বর কবীর জোলার (তাঁতীদের জোলা বা ধানকও বলা হত, কাপড় বোনা ওদের পেশা ছিল) উপরই সঠিক ভাবে মানানসই হয়, একদম খাঁপ খেয়ে যায়। বেদে বর্ণিত কবীর্দেব নাম কবীর পরমেশ্বরেরই বোধ করায়। এই জন্য কবীর জোলাই হলেন পূর্ণ পরমাত্মা। (Kabir the weaver is complete God)।

ঋগ্বেদের ৯ নং মন্ডলের ৮২ নং সুক্তের ২ নং মন্ত্র :-

কবির্বেধস্যা পর্য়েষি মাহিনম্ অত্যঃ ন মৃষ্টঃ অভি বাজম্ অর্ষসি।
অপসেধন্ দুরিতা সোম মৃলয় ঘৃতম্ বসানঃ পরিয়াসি নির্ণিজম্॥ (২)

অর্থাৎ হে পরমেশ্বর! আপনি উপদেশ করার জন্য মানে যথার্থ আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বলার ইচ্ছায় মহাপুরুষদেরকে প্রাপ্ত হয়ে যান। আপনি আপনার নিজস্ব উপরের লোক থেকে চলমান হয়ে এসে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আপনি অত্যন্ত গতিশীল পদার্থের মতো তীব্রগামী হয়ে মানে তড়িৎ গতিতে এসে আমাদের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে অবশ্যই পৌঁছে যান। আপনি কবীর দেব অর্থাৎ কবীর প্রভু। {বেদে পরমেশ্বরের বাস্তবিক নাম, যা ওনার শরীরের নাম, তা কবীর্দেব লেখা আছে। আমরা এবং পূর্বের সব সন্ত **'ব'** (ইংরেজিতে যেমন V শব্দ) কে **'ৰ'** (ইংরেজিতে যেমন B শব্দ) বলি। বাংলা ভাষাতেও দুটি ব ছিল একটি পেট কাটা বর্গীয় ৰ আর অন্যটি পেট না কাটা অন্তঃস্থ-ব' এখন এই দুইটি 'ব'-এর চল উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং একটি পেট না কাটা 'ব' কে রেখে দেওয়া হয়েছে যার

উচ্চারন কিন্তু বর্গীয় ব (ইংরাজী B) এর মতোই করি) যেমন বেদ (Ved'a) কে ৰেদ (Bed'a) বলি, তদ্রুপ বেদে লেখা কবীর্দেবকে কৰীর (KABIR) পরমাত্মা বলতে লাগি। পরমাত্মাও সন্তদের কাছে এই নামে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহম্মদজীকেও কবীর পরমাত্মা সাক্ষাৎ করেছিলেন। ওনাকেও নিজের নাম কবীর আল্লাহ বলেছিলেন। ওই নামকে আল্লাহ আকবীর, আল্লাহ আকবর, আল্লাহ কবীরন ইত্যাদি নামে উচ্চারন করা হয়। হে কবির্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর! আপনি হলেন শুদ্ধ স্বরূপ, আপনি হলেন পাপনাশক। যে পাপের কারণে জীবেরা কষ্ট ভোগ করছে সেগুলি সমাপ্ত করুন। হে কবীর্দেব, এই শক্তি কেবলমাত্র আপনারই আছে। আপনি যেমন নিজের লীলা করেন, তেমনি লীলা করে অর্থাৎ সশরীরে প্রকট হয়ে আমাদের শুধরে নিন।

ঋগ্বেদের ৯ নং মন্ডলের ৯৬ নং সুক্তের ১৭ নং মন্ত্র :–

শিশুম জজ্ঞানম্ হর্য়তম্ মৃজন্তি শুভ্ভন্তিঃ বহিন্ মরুতঃ গণেন।
কবির্গীর্ভি কাব্যেনা কবিঃ সন্ত্ সোমঃ পবিত্রম্ অত্যেতি রেভন্॥ (১৭)

অর্থাৎ যেমনটি কবীর পরমেশ্বরজী নিজের প্রিয় দৃঢ় ভক্ত ধর্মদাসজী এবং গরীবদাসজীকে বলেছিলেন যে, আমি চার যুগে (সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ ও কলি যুগে) সশরীরে প্রকট হই। সংসারে প্রকট হওয়ার জন্য দুই প্রকারের লীলা করি। :-

১. প্রথম লীলা :- প্রত্যেক যুগে শিশু অর্থাৎ নবজাতক বালকের রূপ বানিয়ে পদ্ম ফুলের উপরে বিরাজমান হই। আমার গুপ্ত প্রেরণায় কোন নিঃসন্তান দম্পতি আমাকে ওখান থেকে ঘরে নিয়ে যায়। তারপর আমি বড় হওয়ার লীলা করি, নিজের মুখকমলে উচ্চারণ করে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান বলি, যা আমার কবির বাণীর মাধ্যমে (বেদে "কবির্গীর্ভি") কাব্য করে (কাব্যেনা) অর্থাৎ কবিত্ব করে, দোঁহা, চৌপাই, শব্দ অর্থাৎ কবিতার আকারে বলার কারনে আমি কবি উপাধিও প্রাপ্ত করি। কিন্তু আসলে আমিই হচ্ছি পূর্ণ পরমাত্মা। (কবীর বাণী :- হাম হী অলখ অল্লাহ হ্যাঁয়, মূল রূপ করতার। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মেঁ ম্যাঁয় হী সিরজনহার॥ অর্থাৎ কবীর সাহেব ৬০০ বৎসর পূর্বে কবীর বাণীর মাধ্যমে বলেছিলেন, আমিই হলাম সেই অলখ আল্লাহ, যাকে কেউ জানে না। আমিই হলাম সংসার রুপী বৃক্ষের মূল (root) অর্থাৎ সবাইকে ধারন পোষণ আমিই করি। সমস্ত ব্রহ্মান্ডের উৎপত্তিও আমিই করেছি।)

ঋকবেদ ৯ নং মন্ডলের ৯৬ নং সুক্তে, পরের মন্ত্র ১৮তে এটা স্পষ্ট হচ্ছে, যা পরে বলা হবে।

২. দ্বিতীয় প্রকারের লীলা :- আমি (কবীর) যে কোন দিন, যে কোন সময়, সাধু বেশ ধারণ করে প্রকট হয়ে উৎকৃষ্ট সৎ আত্মাদের সাথে দেখা করি। ওদেরকে সত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানটা বলি। (কলি যুগে যে সব আত্মাদের সাথে পরমাত্মা সাক্ষাৎ করেছিলেন তাদের নাম পূর্বেই বলা হয়েছে। পরমাত্মার শিশু রূপে প্রকট হওয়ার দিনাঙ্ক উপলক্ষে, এই সন্দেশ পুস্তিকা প্রকাশ করা হচ্ছে)। কবীর সাহেবজী বলেছেন যে আমি চার যুগেই শিশু রূপের লীলা করি।

সতযুগ মেঁ সত্সুকৃত কহ টেরা, ত্রেতা নাম মুনিন্দর মেরা।
দ্বাপর মেঁ করুণাময় কহায়া, কলযুগ নাম কবীর ধরায়া॥

অর্থাৎ কবীর সাহেবজী বলেছেন সত্য যুগে আমার নাম সৎসুকৃত ছিল। ত্রেতা যুগে মুনিন্দ্র নাম ছিল, দ্বাপর যুগে ছিল করুণাময় আর কলিযুগে আমি নিজের নাম কবীর বলে নামকরণ করিয়ে ছিলাম।

ঋগ্বেদ ৯ নং মন্ডলের ৯৬ নং সুক্তের ১৭ নং মন্ত্রে বলেছেন :-

অনুবাদ :- পূর্ণ পরমাত্মা (শিশুম জজ্ঞানম্ হর্য়ন্তম্) পরমেশ্বর জেনে বুঝে অর্থাৎ সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসংঘটিত কার্যক্রম অনুসারে তত্ত্ব জ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যে শিশু রূপে প্রকট হন। ওই বালকের শরীর ভীষণ দীপ্তিযুক্ত, কান্তিপূর্ণ হয়। ওই বালক বড় হয়ে তত্ত্ব জ্ঞান বলেন। ওই জ্ঞানকে শুনে (মরুতো গণেন) প্রচুর ভক্ত সমুদায় ওই পরমাত্মার শিষ্য হয়ে যান। ওই ভক্তগন পরমাত্মার মহিমা প্রচার করতে থাকেন। (মৃজন্তি শুভ্যন্তি) পরমাত্মার দ্বারা বলা তত্ত্বজ্ঞান বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন, যা তাদের জন্য অত্যন্ত শুভদায়ক হয়। সেই সাধনা (বহিন্) তাড়াতাড়ি লাভজনক হয়। (কবিঃ সোম) অমর পরমাত্মা "কবীর্দেব", তাঁর তত্ত্বজ্ঞান (কাব্যেনা) কবিতার মাধ্যমে অর্থাৎ বাণী, দোঁহা, চতুষ্পদী শ্লোক রূপে (পবিত্রম্) পবিত্র (কবির্গীর্ভি) কবির্বাণী দ্বারা অর্থাৎ কবীর বাণী দ্বারা (অত্তেতি রেভন সন্) তারস্বরে অতি উচ্চরবে চিৎকার করে বলে বলে শুনিয়ে লীলা করেন। কখনো কখনো বাজারের মাঝে বা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গানের সুরে গাইতে থাকেন। এর পরে ১৮ নং মন্ত্রে বলেছেন এই কারণে পরমাত্মা এক প্রসিদ্ধ কবি পদবী প্রাপ্ত করেন :-

ঋগ্বেদ ৯ নং মন্ডলের ৯৬ নং সুক্তের ১৮ নং মন্ত্রে বলেছেন :-

ঋষিমনা য় ঋষিকৃত্ স্বর্ষাঃ সহস্রণীথঃ পদবীঃ কবিনাম্।
তৃতীয়ম্ ধাম মহিষঃ সিষান্ সোমঃ বিরাজম্ অনুরাজতি স্তুপ্॥ (১৮)

অর্থাৎ (য়) যিনি সন্ত বা ঋষি রূপে প্রকট (ঋষিকৃত) ঋষি দ্বারা রচনা করা (সহস্রণীথঃ) হাজার হাজার সংখ্যায় বাণী (ঋষিমনা) সাধু স্বভাবের ভক্তদের জন্য (স্বর্ষা) স্বর্গের সমান মহাসুখ দায়ী হয়। এই জন্য ওই পরমাত্মা (কবিনাম্ পদবী) বিখ্যাত কবিদের মধ্যে একজন বিখ্যাত কবির পদবী প্রাপ্ত করেন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানটা বাণী, দোঁহা বা চতুষ্পদী শ্লোক, ইত্যাদির মাধ্যমে বলার কারনে পূর্ণ পরমাত্মাকে কবিও বলা হয়। কিন্তু তিনি হলেন আসলে (সোম সন্) অমর পরমাত্মা। ওই পরমাত্মা (মহিষঃ) বড় পৃথিবীতে অর্থাৎ সতলোকে (তৃতীয়ম্ ধাম) তৃতীয় পৃষ্ঠে মানে তৃতীয় ভাগে (সিষাসন) সবাইকে পালন করার ইচ্ছায় (অনুরাজতি) তেজোময় বা জ্যোতির্ময় শরীর যুক্ত (স্তুপ) গম্বুজ যুক্ত মহলে (বিরাজম্) বিরাজমান আছেন। ওখানে রাজার সদৃশ বসে আছেন। ঋগ্বেদের ৯ নং মন্ডলের ৫৪ নং সূক্তের ৩ নং মন্ত্রেও প্রমান আছে যে, পরমাত্মা (বিশ্বানি ভূবনোপরি তিষ্ঠন্তি) সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উপরের ভাগে বসে আছেন।

ঋগ্বেদ ৯ নং মন্ডলের ৯৫ নং সূক্তের ২ নং মন্ত্র :-

হরিঃ সৃজানঃ পথ্যাম্ ঋতস্য ইয়র্তি বাচম্ অরিতেব নাবম্।
দেবঃ দেবানাঁম্ গুহ্যানি নাম অবিষ্কৃণোতি বর্হিষি প্রবাচে॥

অর্থাৎ (হরিঃ সৃজানঃ) ওই পূর্বোক্ত পরমেশ্বর নিজের থেকে অন্যরকমের সহজ সরল শরীর বানিয়ে পৃথিবীতে প্রকট হয়ে (ঋতস্যা পথ্যাম্ বাচম্) নিজের বাণী দ্বারা ভক্তির সত্য পথটা বলেন আর ভক্তদের (ইয়র্তি) সত্য সাধনা করার জন্য প্রেরনা দেন। পরমাত্মার দ্বারা বলা সত্য সাধনা, সাধককে এমন ভাবে ভব সাগর থেকে পার করে দেয়, যেমন করে (অরিতেব নাবম্) একটি নৌকা নদী পার করে দেয়। (দেবানাম্ দেবঃ) সমস্ত দেবতাদেরও দেব অর্থাৎ সর্ব প্রভুদেরও প্রভু মানে পরমেশ্বর (বর্হিষি প্রবাচে) বাণী রুপী যজ্ঞের জন্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা (গুহ্যানি) গুপ্ত (নাম) ভক্তির নাম বা মন্ত্র (আবিষ্কৃণোতি) আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ যে যথার্থ ভক্তির মন্ত্রগুলি প্রচলিত গ্রন্থে নেই, সেই মন্ত্রগুলি প্রকট করেন।

কবীর পরমেশ্বর নিজের অমৃত বাণীতে (তত্ত্বজ্ঞানে) বলেছেন :-

সোহম্ শব্দ হম জগ মেঁ লাএ। সার শব্দ হম গুপ্ত ছুপাএ॥
সোহম্ উপর ঔর হ্যায় সত্সুকৃত এক নাম।
সব হংসোঁ কা জহাঁ বাস হ্যায় বস্তী হ্যায় বিন থাম॥

অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বরজী বলেছেন যে আমি, সোহম্ নাম আবিষ্কার করেছি অর্থাৎ এই জগতে নিয়ে এসেছি, সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ (প্রকট) করেছি। এই সোহম এর উপরে মানে অন্য আর এক শ্রেষ্ঠ নাম আছে। সেই নাম যা আমি এখনো লুকিয়ে রেখেছি, এই নাম কলিযুগের ৫৫০৫ বৎসর (১৯৯৭ সালে কলিযুগ ৫৫০৫ বছর সম্পূর্ণরূপে ব্যতীত হয়েছে, তখন অব্দি) ধরে গুপ্ত রাখার প্রয়োজন ছিল। কবীর সাগর গ্রন্থে পরমাত্মা বলেছেন :-

ধর্মদাস মেরী লাখ দুহাই সার শব্দ বাহর না জাই। সারশব্দ বাহর জো পরহী। বিচলী পীঢ়ী হংস নহী তিরহী॥
সার শব্দ তব তক ছুপাই। জব পাঁচ হাজার পাঁচ সৌ পাঁচ কলযুগ ন বীত জাই॥

অর্থাৎ কবীর সাহেবজী এই দুই নাম (সোহম আর সারশব্দ) সন্ত ধর্মদাসজীকে বলেছিলেন। কিন্তু অন্য কাউকে বলতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন কলিযুগের উপরোল্লিখিত সময় পর্যন্ত সার শব্দ লুকিয়ে রাখতে হবে। আর যদি তা না করা হয় তাহলে মধ্যবর্তী প্রজন্ম বা মধ্যম পিঁড়ি অর্থাৎ ১৯৯৭ সাল থেকে যে সত্ ভক্তির মার্গ চালান হবে, তাতে ওই জীব আত্মারা (এদের বিচলি পিঁড়ি বা মধ্যবর্তী প্রজন্ম বলা হয়) পার হতে পারবে না। ওই সময় অর্থাৎ কলিযুগের ৫৫০৫ বৎসর সম্পূর্ণরূপে ব্যতীত হওয়ার পরে আমার আদেশ অনুসারে এক মহাপুরুষ এই সারশব্দ তার শিষ্যদের বলবেন। সমস্ত সংসার ওই মহাপুরুষের কাছ থেকে নাম দীক্ষা নেবে। ওই সময় কলিযুগেই সত্য যুগের গোঁড়াপত্তন হবে। ওই সময় সমস্ত নর নারী যে সব শুদ্ধ সৎ আত্মা, পরমাত্মাকে ভয় করে, তারা পাপ কর্ম ছেড়ে দিয়ে পূণ্য কর্মকারী ও পরমার্থ কর্মকারী হবে। বিভিন্ন প্রকারের সব ধর্ম এবং জাতি, একটি মানব ধর্ম এবং জীব জাতিতে পরিণত হয়ে যাবে।

এর প্রমান পবিত্র কবীর সাগর গ্রন্থের স্বসমবেদ বোধ অধ্যায়ের পৃষ্ঠা নং ১২১ ও ১৭৮ তে লেখা আছে। ঋগ্বেদের ৯ নং মন্ডলের ৯৪ নং সূক্তের ১ নং মন্ত্র :- এই মন্ত্রে বলেছেন পরমাত্মা তত্ত্বজ্ঞান (কৃণানঃ পবতে কবিয়ন্ ব্রজম্) কবিদের মতো আচরণ করে কবীর বাণীর অমৃত বর্ষা করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সর্ব আত্মাদের পবিত্র করেন।

ঋগ্বেদের ৯ নং মন্ডলের ২০ নং সুক্তের ১ নং মন্ত্র :-

প্র কবীর্দেব বিতয়ে অব্যঃ বারেভি অর্ষতি সাহ্যান্ বিশ্বাঃ অভি স্পৃস্ধঃ।

অর্থাৎ (প্র) বেদ জ্ঞান দাতা কাল ব্রহ্ম থেকে অন্য (কবীর্দেব) কবীর্দেব অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বর (বারেভি) শ্রেষ্ঠ আত্মাদের (বীতয়ে) ভক্তি ধন প্রাপ্তির জন্য (আর্ষতি) জ্ঞান দেন। তিনিই (অব্যঃ) অবিনাশী সকলের রক্ষক। (সাহ্যান) সহনশীল। (বিশ্বা) সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানহীন লোকেদের (স্পৃসধঃ) আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তর্ক-বিতর্কের বেপরোয়া স্পর্ধা যুক্ত বাকযুদ্ধে (অভি) তিরস্কৃত করেন, অর্থাৎ অজ্ঞানীদের পরাজিত করে দেন।

ভাবার্থ :– এই বেদ মন্ত্রেও একই প্রমান আছে যে কবীর্দেব অর্থাৎ কবীর পরমাত্মা, শুদ্ধ আত্মাদের জ্ঞান দেন। যিনি অজ্ঞানীদের জ্ঞান যুদ্ধে তিরস্কৃত করেন, তিনি কাল পুরুষ থেকে অন্য পুরুষ।

অজ্ঞানীদের তিরস্কৃত করার প্রমান :-

॥ পরমেশ্বর কবীর (কবীর্দেব) ও সর্বানন্দের শাস্ত্রীয় তর্ক-বিতর্ক ॥

সর্বানন্দ নামের এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁর মাতা শ্রীমতি শারদাদেবী পূর্বজন্মের কৃত কর্মের ফলে (প্রারব্ধের পাপকর্মের ফলে) পীড়িত ছিলেন। তিনি বহু বছর যাবৎ কষ্ট নিবারণের জন্য সমস্ত রকমের পূজা এবং যন্ত্র-মন্ত্র করানো ইত্যাদি সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা করেন। শারীরিক পীড়া নিবারনের জন্য অনেক বৈদ্যদেরকেও দেখান, প্রচুর ওষুধপত্রও খান কিন্তু তাতে কোন কষ্ট লাঘব হয়নি। ওই সময়ের বিভিন্ন মহর্ষিদের কাছে নাম দীক্ষাও নিয়েছিলেন কিন্তু সমস্ত মহর্ষিগণ বলেন, পুত্রী শারদা! তোমার এটা পূর্ব জন্মের পাপকর্মের মাশুল বা দণ্ড, যাকে প্রারব্ধ কর্মফলও বলা হয়। এর ক্ষমা হবে না, এটা তো ভুগতেই হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলেন, ভগবান শ্রীরাম বালিকে বধ করেছিলেন, ওই পাপ কর্মের দণ্ড শ্রীরামের আত্মাকে শ্রীকৃষ্ণ জন্মে ভুগতে হয়েছিল। শ্রীরামের আত্মা (বিষ্ণু) দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্ম গ্রহন করেন এবং শ্রী বালির আত্মা শিকারি হয়ে জন্ম নেয়। শিকারি (বালির আত্মা) শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ করে তাকে হত্যা করেছিল। এই ধরণের ব্যাখ্যা গুরু-মহন্ত এবং সন্ত-ঋষিদের মুখ থেকে শুনে ভক্তমতি শারদা দুঃখী মনে কেঁদে কেঁদে প্রারব্ধের পাপকর্মের কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। এক দিন নিজের কোনো এক আত্মীয়ের কথায়, কাশীতে স্বয়ং সশরীরে প্রকট হওয়া (স্বয়ংভূ) কবীর পরমেশ্বরের (কবির্দেবের) কাছ থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে নেন আর নাম দীক্ষা নেওয়ার দিন থেকেই তার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়। কেননা পবিত্র যজুর্বেদের ৫ নং অধ্যায়ের ৩২ নং মন্ত্রে লেখা আছে, "কবিরংঘারিরসি" অর্থাৎ (কবীর) কবীর্দেব মানে কবীর প্রভু (অংঘারি) পাপের শত্রু (অসি) হন। আবার পবিত্র যর্জুবেদের ৮ নং অধ্যায়ের ১৩ নং মন্ত্রে লেখা আছে পরমাত্মা (এনসঃ এনসঃ) অধর্ম থেকেও অধর্ম অর্থাৎ পাপের থেকেও মহাপাপ মানে ঘোরপাপকেও সমাপ্ত করে দেন। প্রভু কবীর্দেব (কবীর পরমেশ্বর) বলেন পুত্রী শারদা! এই সুখ তোমার ভাগ্যে ছিল না। আমি আমার নিজের তহবিল থেকে (কোষাগার থেকে) তোমাকে এই সুখ প্রদান করেছি তথা পাপ বিনাশকারী হওয়ার প্রমাণ দিয়েছি। তোমার পুত্র সর্বানন্দজী বলে বেড়ায়, "প্রভু পাপ কর্ম ক্ষমা (বিনাশ) করতে পারেন না। সঙ্গে এটাও বলে যে আমার কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে আত্মার কল্যাণ করাও।" ভক্তমতী শারদাজী স্বয়ং এসে প্রভু কবীরের কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে নিজের আত্মার কল্যাণ করায়। ভক্তমতি শারদার পুত্রের শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কে খুব উৎসাহ ছিল। নিজের সমসাময়িক সমস্ত বিদ্বানদেরকে শাস্ত্রীয় বিতর্কে পরাজিত করে দিয়েছিলেন। পরে এইরকম যুক্তি চিন্তা মাথায় আসে যে, আমাকে বার বার করে প্রত্যেক জনকে ধরে ধরে বলতে হয় যে, আমি সমস্ত বিদ্বানদেরকে হারিয়ে জয়লাভ করেছি। এর থেকে ভালো হয় যদি আমার মাকে বলে আমার নামটাকে পরিবর্তন করিয়ে সর্বাজিত রাখি। এই চিন্তা করে সর্বানন্দ মায়ের কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানায় যে, মা! আমার নামটা পরিবর্তন করে সর্বাজিত রেখে দাও। মা বলেন, পুত্র! সর্বানন্দ নামটা কি খারাপ? মহর্ষি সর্বানন্দ বলেন, মা! তুমি তো জানো যে, আমি সমস্ত বিদ্বানদেরকে শাস্ত্রীয় বিতর্কে হারিয়ে দিয়ে জিতে গেছি, এইজন্য আমার নাম সর্বাজিত রেখে দাও। তখন মা বলে, পুত্র! আরও একটি বিদ্বান আছেন, আমার গুরু মহারাজ কবীর্দেব (কবীর প্রভু), তাঁকেও হারিয়ে দাও তো দেখি। আর জয়লাভ করে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পুত্রের নাম সর্বাজিত রেখে দেব। মায়ের কথা শুনে শ্রী সর্বানন্দ প্রথমে তো হাসতে থাকেন, পরে বলেন, মা তুমি বড় সাদাসিধে, ভোলা ভালা। ওই জোলা (ধানক) কবীর তো অশিক্ষিত। ওকে আর কি হারাবো? যাবো আর তক্ষুনি চলে আসবো।

মহর্ষি সর্বানন্দজী সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থগুলিকে একটি বলদের পিঠে চাপিয়ে ওই মহল্লায় গেলেন যেখানে কবীর্দেবের (কবীর পরমেশ্বরের) কুটির ছিল। রাস্তায় কবীর পরমেশ্বরের পালিত কন্যা কামালীর সঙ্গে কুঁয়োর কাছে দেখা হল। সে কুঁয়ো থেকে জল তুলছিল। সর্বানন্দের হঠাৎ ভীষণ জলতেষ্টা পেয়ে

গেলো। তিনি ওই মেয়েটিকে বললেন, এই মেয়ে! একটা কথা শোন, আমাকে খুব তাড়াতড়ি একটু জল খাওয়া, তেষ্টায় আমার প্রাণটা যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি বালতি করে জল তুলে সর্বানন্দকে জল খাওয়ালো। ওই সময় জোলা কলোনির লোকজন তাদের নিজের নিজের ঘর থেকেই এই ঘটনাটা দেখছিল আর ভাবছিল, ইনি তো ব্রাহ্মণ, মনে হয় ভুল করে এখানে এসে গেছেন। জলতেষ্টা মিটে যাবার পর সর্বানন্দজী এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন যে, জোলাদের কলোনিতে তার জল খাওয়াটা কেউ দেখে ফেলে নি তো! তিনি দেখলেন বেশ কিছু স্ত্রী এবং পুরুষেরা, তার দিকে তাকাচ্ছে আর হাসছে। তখন তিনি নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য বললেন, এই মেয়েটা! এটা কোন জাতের লোকেদের কুঁয়ো রে?

কামালী উত্তর দিল, ব্রাহ্মণমশাই! জোলা কলোনিতে জোলাদের কুঁয়োই থাকে, ব্রাহ্মণদের কুঁয়ো তো হয় না। সর্বানন্দ উঁচু গলায় জোরে জোরে বললেন এই বোকা মেয়ে! আগে কেন বলিস নি রে, যে এটা শুদ্র জাতির কুঁয়ো! আমার ধর্মভ্রষ্ট করে দিলি। কামালী তখন জবাব দিল, ব্রাহ্মণ মশাই! তখন তো আপনার তেষ্টায় প্রাণটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, আর যেই তেষ্টা মিটে গেল অমনি আপনার জাতির কথা মনে পড়ে গেলো? তখন সর্বানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, এই মেয়েটা, বেশি বকিস না, কবীরের ঘর কোথায় বলে দে। কামালী বলল :-

কবীর কা ঘর শিখর মে, জহাঁ সলৈলী গৈল।
পাঁব না টিকৈঁ পপীল (পিঁপড়ে) কে, পণ্ডিত লাদৈ বৈল॥

ভাবার্থ :- কামালী বোন বলল যে, কবীর এর আসল ঘর সতলোকে আছে। ওখানে যাওয়ার রাস্তাটা বড় পিচ্ছিল। সত্য সাধনা করে তবেই ওনার ঘরে যাওয়া যায়। ওখানে তো পিঁপড়েও পর্যন্ত যেতে পারেনা। আপনি তো বলদ এর উপরে এত গ্রন্থ চাপিয়ে নিয়ে ঘুরছেন, যেগুলোর মধ্যে পরমাত্মা প্রাপ্তির বিধি নেই। সর্বানন্দ বলেন, এই মেয়েটা! সোজা কথায় উত্তর দে না! এই কলোনিতে কবীর কোথায় থাকে বল। কামালি বোন বলল, ব্রাহ্মণ মশাই! আমার পিছনে পিছনে চলে আসুন। আমি ওনারই মেয়ে। কামালী বোন তার নিজের ঘরের দরজায় এসে বলল, মহর্ষিজী, এটাই হল পরমপিতা কবীরের ঘর। শ্রী সর্বানন্দজী নিজের লোটাটা কামালীকে দিয়ে এতখানিই ভর্তি করে নিলেন যে আর এক বিন্দু জল দিলেই যেন উপচে পড়ে যাবে। এবং তারপর কামালীকে বললেন, এই মেয়ে! ধীরে ধীরে এই লোটাটা সামলিয়ে নিয়ে গিয়ে কবীরকে দে। আর কবীর কি উত্তর দেয় তা আমাকে বলবি। মেয়ে কামালীর দ্বারা নিয়ে আসা লোটাতে পরমেশ্বর কবীর সাহেবজী (কবীর দেব) একটি কাপড় সেলাই করা বড় সুঁচ ফেলে দেন, আর তার ফলে কিছু জল লোটা থেকে বের হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং তারপর বললেন, বেটি! এই লোটাটি সর্বানন্দজীকে ফিরিয়ে দাও। জলে ভরা পাত্র হাতে নিয়ে কামালী ফিরিয়ে আনলে সর্বানন্দজী কামালীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি উত্তর দিয়েছে রে কবীর? কামালি তখন প্রভুর দ্বারা সুঁচ ফেলার বৃত্তান্ত শোনালো। তখন মহর্ষি সর্বানন্দজী পরম পূজ্য কবীর (কবীর্দেব) পরমেশ্বরকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার প্রশ্নের কি উত্তর দিলেন বলুন। প্রভু কবীরজী বললেন, আপনার প্রশ্নটা কি ছিল?

মহর্ষি শ্রী সর্বানন্দজী বললেন, আমি সমস্ত বিদ্বানদেরকে শাস্ত্রীয় বিতর্কে পরাজিত করে দিয়েছি। আর আমি আমার নিজের মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমার নাম সর্বাজীত রেখে দাও। আমার মা, আপনাকে হারিয়ে দিয়ে জিতলে পরে তবেই আমার নাম পরিবর্তন করে দেবেন বলেছেন। আপনার কাছে লোটাকে জলে পরিপূর্ণ করে পাঠানোর তাৎপর্য এই ছিল যে, আমি এতটাই জ্ঞানে পরিপূর্ণ যেমন

লোটাটা জল দ্বারা পরিপূর্ণ। এতে আর জল ধরবে না, আরো ভরতে গেলে বাইরে জল উপচে পড়ে যাবে। অর্থাৎ আমার সঙ্গে জ্ঞান চর্চা করে কোন লাভ নেই। আপনার জ্ঞান আমার ভিতরে প্রবেশ করবে না, বৃথাই মুখের থুতু শুকিয়ে যাবে। তাই পরাজয় লিখে দিন, এতেই আপনার হিত হবে।

পূজনীয় কবীর পরমেশ্বরজী (কবীর দেব) বললেন, আপনার জলে পরিপূর্ণ লোটাতে লোহার সুঁচ ফেলার মানে হল, আমার জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) এতটাই ভারী (সত্য) যেমন সুঁচটা লোটার জল বাইরে অপসারণ করে তলায় গিয়ে ঠেকেছে। তদ্রুপ আমার তত্ত্বজ্ঞান আপনার অসত্য জ্ঞানকে (লোকবেদ অর্থাৎ গল্পকথা/প্রচলিত জনশ্রুতি/লোককাহিনী/পৌরাণিক-কাহিনী ইত্যাদিকে) বাইরে বের করে দিয়ে আপনার হৃদয়ে গিয়ে বসে যাবে। তখন মহর্ষি সর্বানন্দজী বললেন তাহলে আপনি এবার প্রশ্ন করতে শুরু করুন আর আমি সেগুলোর উত্তর দেব। একজন বহু খ্যাতনামা বিদ্বানকে জোলাদের (তাঁতীদের) পাড়ায় আসতে দেখে আশে-পাশের সাদাসিধে ভোলাভালা অশিক্ষিত জোলা ব্যক্তিরা শাস্ত্রচর্চা শোনার জন্য একত্রিত হয়ে যায়।

পূজনীয় কবীর দেব প্রশ্ন করেন -

কৌন ব্রহ্মা কা পিতা হ্যায়, কৌন বিষ্ণু কি মাঁ।
শংকর কা দাদা কৌন হ্যায়, সর্বানন্দ দে বাতাএ॥

মহর্ষি সর্বানন্দজীর উত্তর :- শ্রী ব্রহ্মা রজগুণ, শ্রী বিষ্ণু সত্ত্বগুণ যুক্ত এবং শ্রী শিবজী তমগুণ যুক্ত। এই তিন দেব অজর-অমর অর্থাৎ অবিনাশী, সর্বেশ্বর-মহেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়। এদের মাতা পিতা কেউ নেই। আপনি অজ্ঞানী, আপনার শাস্ত্রের কোন জ্ঞান নেই। কি সব ফালতু উল্টো-পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন? উপস্থিত সমস্ত শ্রোতারা তালি বাজিয়ে মহর্ষি সর্বানন্দজীকে সমর্থন জানালো।

পূজনীয় পরমেশ্বর কবীর প্রভুজী (কবীর্দেব) বললেন, মহর্ষিজী, আপনি গীতা ছুঁয়ে ভগবানকে সাক্ষী রেখে, শ্রীমদদেবীভাগবত পুরাণের তৃতীয় স্কন্দ আর শ্রী শিবপুরাণের ষষ্ঠ স্কন্দে, রুদ্র সংহিতার সপ্তম অধ্যায় পড়ুন এবং অনুবাদ করে শোনান। মহর্ষি সর্বানন্দজী পবিত্র গীতার উপর হাত রেখে শপথ করে বললেন আমি সঠিক অনুবাদ করে শোনাব।

প্রভু কবীরজীর বলার পরে সর্বানন্দজী মনোযোগ সহকারে পবিত্র পুরাণগুলি পড়ে দেখেন। শ্রী শিব পুরাণের (গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত, যেটার অনুবাদক হল শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার) পৃষ্ঠা ১০০ থেকে ১০৩ এর মধ্যে লেখা আছে যে সদাশিব অর্থাৎ কাল রূপী ব্রহ্ম ও প্রকৃতির (দূর্গা) সংযোগে (পতিপত্নীরূপে ব্যবহারে) সত্ত্বগুণ শ্রী বিষ্ণুজী, রজগুণ শ্রী ব্রহ্মাজী ও তমগুণ শ্রী শিবজীর জন্ম হয়। এই প্রকৃতি (দূর্গা) যাকে অষ্টাঙ্গী বলা হয়, তাঁকে ত্রিদেবের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের) মাতাও বলা হয়।

পবিত্র শ্রীমৎ দেবী ভাগবত পুরাণের (গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত. অনুবাদক শ্রী হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, চিমনলাল গোস্বামী) তৃতীয় স্কন্দে পৃষ্ঠা নং ১১৪ থেকে ১২৩ এর মধ্যে স্পষ্ট বর্ণনা করা আছে যে, ভগবান বিষ্ণু বলছেন, এই প্রকৃতি (দূর্গা) আমাদের তিনজনের জননী। আমি যখন ছোট বাচ্ছা ছিলাম তখন আমি এনাকে দেখেছি। মায়ের স্তুতি করে বিষ্ণু বলছেন হে মাতা! আমি (বিষ্ণু), ব্রহ্মা, ও শিব তিনজনই নাশবান। আমাদের তো অবির্ভাব (জন্ম) ও তিরোভাব (মৃত্যু) হতে থাকে। আপনি প্রকৃতি দেবী সনাতনী। ভগবান শঙ্কর বলেন হে মাতা! যদি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আপনার থেকে উৎপন্ন হয়, তাহলে আমি শঙ্করও আপনার থেকেই উৎপন্ন হয়েছি অর্থাৎ আপনি আমারও মাতা (মা)।

মহর্ষি সর্বানন্দজী পূর্বে লোক মুখে শোনা (লোক বেদ) শাস্ত্র বিরুদ্ধ আধো অপূর্ণ জ্ঞানের আধারে ত্রি-দেবকে (শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীশিবকে) অবিনাশী এবং অজন্মা বলে রটাতেন। পুরাণ পড়েও অজ্ঞানী ছিলেন। কারণ ব্রহ্ম (কাল) পবিত্র গীতায় - ৭ নং অধ্যায়ের ১০ নং শ্লোকে বলেছেন যে সর্ব প্রাণীদের (যারা ২১ ব্রহ্মাণ্ডে আমার অধীনে আছে) বুদ্ধি আমিই। আমার যখন ইচ্ছা হয় তখন জ্ঞান প্রদান করি এবং যখন ইচ্ছা হয় অজ্ঞানতা ভরে দিই। ওই সময় পূর্ণ পরমাত্মা দ্বারা পুরাণের অধ্যায় এবং পৃষ্ঠা নম্বর বলে দেওয়ার পরে কালের (ব্রহ্ম) প্রভাব বাধা দূরে সরে যায় এবং ওটাতে বাস্তবে কি লেখা আছে, সর্বানন্দ তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরে যান। বাস্তবে এমনটিই লেখা আছে। কিন্তু সম্মান হানির ভয়ে তিনি মিথ্যা করে বলে দেন যে, আমি পুরোটাই পড়ে নিয়েছি এরকম কিছু এখানে কোথাও লেখা নেই। কবীর দেবকে (কবীর পরমেশ্বরকে) বলেন, তুই মিথ্যাবাদী। তুই কি জানিস শাস্ত্রের বিষয়ে। আমি প্রত্যেক দিন শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। তারপর কি হল, সর্বানন্দজী একটানা হড়হড় করে অপ্রাসঙ্গিক সংস্কৃত শ্লোক আদি আওড়াতে শুরু করে দিলেন। ২০ মিনিট পর্যন্ত মুখস্থ রাখা বেদের বাণী ঝড়ঝড় করে বলতে থাকলেন, পুরাণটা আর পড়েও শোনালেন না।

উপস্থিত সমস্ত অশিক্ষিত সাদাসিধে শ্রোতারা, যারা সংস্কৃত ভাষা বোঝেও না, তারা মহর্ষি সর্বানন্দের অনর্গল মুখস্থ রাখা সংস্কৃত বুলি, ভাষা অলংকারে মুগ্ধ হয়ে হাত তালি বাজিয়ে বাহবা দিয়ে তাকে সমর্থন করতে লাগে আর তাকে মহাজ্ঞানী বলতে লাগলো। শেষমেষ এটা দাঁড়ালো যে, পরমেশ্বর কবীরজী তর্কে হেরে গেছেন এই বলে দিল আর মহর্ষি সর্বানন্দকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করে দেওয়া হল। পরম পূজনীয় কবীর সাহেব বললেন, সর্বানন্দজী আপনি যে পবিত্র গীতার উপর হাত রেখে শপথ করেছিলেন তাও ভুলে গেলেন। আপনি সামনে রাখা শাস্ত্রের লেখা সত্যকে যখন মানছেন না, তখন কি আর করবো, ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তিকে জাগানো সম্ভব, কিন্তু জেনে বুঝে যে ঘুমানোর ভান করে তাকে জাগানো যায় না।

কবীর, জান বুঝ সাঁচি তাজ্যে করে ঝুট সে নেহ। তাকী সঙ্গতি হে প্রভু স্বপ্ন মেঁ ভি না দে।

এইজন্য, হে সর্বানন্দ! আমি পরাজিত হয়ে গেছি আর আপনি জিতে গেছেন।

এক জমিদার কৃষকের পুত্র সপ্তম শ্রেণীতে পড়ত। সে সামান্য কিছু ইংরেজী ভাষা শিখেছিল। একদিন পিতা-পুত্র গরুর গাড়িতে করে চাষের ক্ষেতের দিকে যখন যাচ্ছিল, সামনের দিক থেকে এক ইংরেজ চার চাকা গাড়ি (car) নিয়ে এসে দাঁড়ায়। সে গরুর গাড়ির আরোহীদের কাছে ইংরেজী ভাষায় রাস্তা জিজ্ঞাসা করে। তখন কৃষক পিতা তার পুত্রকে বলে, বেটা! এই ব্যাটা ইংরেজ নিজেকে খুব শিক্ষিত প্রমাণ করতে চাইছে। তুমিও তো ইংরেজী ভাষা জানো। বের করে দাওনা, ওর অহঙ্কার! ইংরেজি বলে শুনিয়ে দাও তো। কৃষকের ছেলেটি, অসুস্থতার জন্য ছুটি মঞ্জুর এর প্রার্থনা পত্র (যেটা ওর মুখস্ত ছিল) শুনিয়ে দেয়। ইংরেজ ওই অবোধ বাচ্ছার জ্ঞানহীনতার কথা উপলব্ধি করে নেয় যে, জিজ্ঞাসা করছি রাস্তা আর শোনাচ্ছে অসুস্থতায় ছুটি মঞ্জুর এর প্রার্থনা পত্র। হায় কপাল! বলে কপাল চাপড়ে নিজের গাড়ি নিয়ে চলে যায়। তখন চাষী, পুত্রের পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়ে বলে পুত্র! আজ তুই আমার জীবন সফল করে দিয়েছিস। আজ তুই ইংরেজকে ইংরেজী ভাষায় পরাজিত করে দিয়েছিস। তখন পুত্র বলে, বাবা "মাই বেস্ট ফ্রেন্ড" (আমার প্রিয় বন্ধু) রচনাটাও মুখস্ত ছিল, যদি সেইটা শোনাতাম তাহলে তো ইংরেজ গাড়ি ফেলে রেখে পালাত। সেইরকম ভাবে এখানে - কবীর্দেব যা জিজ্ঞাসা করছেন সর্বানন্দ তাঁর উত্তর অন্য কিছু দিচ্ছেন। এই ভাবে এনার মতো লোকেরা অর্থহীন অপ্রাসঙ্গিক কথায় শাস্ত্রীয়-তর্ক-বিতর্ক করে তত্ত্বজ্ঞানকে জট পাকিয়ে সবাইকে বিভ্রান্ত করে রেখেছেন।

পরমপূজনীয় কবীর পরমেশ্বর (কবীর্দেব) বললেন যে, হে সর্বানন্দজী! আপনি জিতে গেলেন আর

আমি হার স্বীকার করে নিলাম। মহর্ষি সর্বানন্দজী বললেন যে, আমাকে এটা লিখিত রূপে আপনাকে দিতে হবে, আমি কোন কাঁচা কাজ করি না। পরমেশ্বর কবীরজী (কবীর্দেব) বললেন, এই কৃপাটাও আপনিই করুন। যা লেখার আছে তা লিখে নিন, আমি টিপ সই লাগিয়ে দিচ্ছি। মহর্ষি সর্বানন্দজী তখন নিজেই লিখে নিলেন যে, শাস্ত্রীয়-তর্ক-বিতর্কে সর্বানন্দ বিজয়ী হয়েছেন, আর কবীর সাহেব পরাজিত হয়েছেন। এরপর কবীর সাহেবকে দিয়ে টিপ সই করিয়ে নিলেন। নিজের মায়ের কাছে গিয়ে সর্বানন্দজী বললেন, মা! এই নাও তোমার গুরুদেবকে পরাজিত করার প্রমাণ। ভক্তমতি শারদাজী বললেন, পুত্র! আমাকে পড়ে শোনাও। যখন সর্বানন্দজী পড়তে লাগলেন, ওখানে লেখা ছিল যে, শাস্ত্রীয়-তর্ক-বিতর্কে সর্বানন্দজী পরাজিত হয়েছেন এবং কবীর পরমেশ্বরজী বিজয়ী হয়েছেন। সর্বানন্দজীর মা বললেন, পুত্র! তুমি তো বলেছিলে বিজয়ী হয়েছো! তুমি তো পরাজিত হয়ে এসেছো। মহর্ষি সর্বানন্দ বলে, মা! আমি কয়েকদিন ধরে লাগাতার শাস্ত্রীয়-তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত ছিলাম, তাই নিদ্রাবশত লিখতে ভুল হয়ে গেছে। আমি লিখতে ভুল করে ফেলেছি। আবার আমি যাচ্ছি, এবারে ঠিক করে লিখে নিয়ে আসব। মা শর্ত রেখেছিল যে বিজয়ী হওয়ার লিখিত ভাবে কোন প্রমাণ দিলে তবেই আমি মেনে নেব, তাই মৌখিক কথায় হবে না। মহর্ষি সর্বানন্দজী দ্বিতীয় বার গিয়ে বলেন, কবীর সাহেব! আমার লেখাতে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে, পুনরায় লিখতে হবে। কবীর সাহেব বলেন যে, কোন ব্যাপার নয়, আবার লিখে নিন। সর্বানন্দজী পুনরায় লিখে কবীর সাহেবের আঙুলের ছাপ লাগিয়ে মায়ের কাছে এলে, ওটা পড়ার সময় আবার আগের মতই উল্টো লেখা দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, মা! আবার যাচ্ছি। তৃতীয় বার লিখে আনেন আর ঘরের ভিতর ঢোকার আগে একবার পড়ে দেখে নেন যে, লেখাটা ঠিক আছে কিনা। তারপর সর্বানন্দজী ওই লেখার উপর থেকে আর দৃষ্টি সরান না, আর চলতে চলতে ঘরে প্রবেশ করতে করতে বলেন, মা! এই যে পড়ে শোনাচ্ছি, এই বলে যখন পড়তে লাগেন তখন তাঁর চোখের সামনে অক্ষর পাল্টে যায়। তৃতীয় বারও সর্বানন্দজী ওই একই প্রমাণ লিখিত আছে দেখতে পান যে, শাস্ত্রীয়-তর্ক-বিতর্কে সর্বানন্দ পরাজিত হয়েছেন আর কবীর সাহেব বিজয়ী হয়েছেন। সর্বানন্দজী হতবাক হয়ে গেলেন। মুখে কোন কথা সরলো না। তখন মা বলেন, পুত্র! আরে তোর মুখ বন্ধ হয়ে গেল কেন? কি লেখা আছে পড়ে শোনা। মা জানত এই অবোধ পুত্র পাহাড়ের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করছে। মা সর্বানন্দকে বলেন পুত্র! পরমেশ্বর এসেছেন। পরমেশ্বরের শ্রীচরণে পড়ে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নে, আর উপদেশ নিয়ে নিজের মনুষ্য জীবন সফল করে নে। সর্বানন্দজী নিজের মায়ের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন, আর বললেন, মা! এতো স্বয়ং প্রভু এসেছেন। তুমি আমার সাথে চলো, আমার লজ্জা লাগছে। তখন সর্বানন্দের মা সর্বানন্দকে নিয়ে পরমেশ্বর করীর সাহেবের কাছে যান, আর সর্বানন্দকে কবীর পরমেশ্বরের কাছে নাম দীক্ষা দেওয়ান। তখন মহর্ষি বলে পরিচিত ওই অবোধ প্রাণীর, পূর্ণ পরমাত্মার শ্রীচরণে আসায় উদ্ধার হয়। পূর্ণ ব্রহ্ম কবীর সাহেব (কবীর্দেব) বলেন, সর্বানন্দ! তুমি অক্ষর জ্ঞানের আধারেও শাস্ত্রকে বুঝতে পারো নাই। কারণ আমার শরনে না আসা পর্যন্ত কাল (ব্রহ্ম) কোন প্রাণীর বুদ্ধিকে পূর্ণরূপে বিকশিত হতে দেয় না। এখন আবার পড়ো ওই পবিত্র বেদগুলি, পবিত্র গীতা ও পবিত্র পুরাণগুলি। এখন তুমি ব্রাহ্মণ হয়ে গিয়েছো। "ব্রাহ্মণ সোই যো ব্রহ্ম পহচানে" যে ব্রহ্মকে চিনতে পারে তাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। বিদ্বান সেই জন, যে পূর্ণ পরমাত্মাকে চিনে নিয়ে নিজের কল্যাণ করায়।

বিশেষ :- আজ ২০১৩ সাল থেকে বিগত প্রায় ৬০৮ বৎসর পূর্বে এই পবিত্র বেদ, পবিত্র গীতা, পবিত্র পুরাণে লেখা জ্ঞানটা, কবীর পরমেশ্বর (কবীর্দেব) নিজের সহজ সরল বাণীর মাধ্যমেও দিয়েছিলেন। (কবীর সাহেব পাঁচ বৎসর বয়সে এই অমৃত জ্ঞান বলা শুরু করেন, যা ১৪৯৩ সালে শ্রী ধর্মদাসকে দিয়ে

লিপিবদ্ধ করানো হয়) যেটা ওই সময় থেকে আজ পর্যন্ত মুনি, ঋষি, পণ্ডিত ব্যক্তিরা এগুলিকে ব্যাকরণের হিসাবে ত্রুটি যুক্ত ভাষা বলে দিয়ে, পড়ার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এবং এনারা রটিয়ে দেন, কবীর তো অজ্ঞানী, অক্ষর জ্ঞান তো ওর একদম নেই। ও কি করে জানবে সংস্কৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা গুঢ় রহস্য। আমরা বিদ্বান, আমরা যা বলি তা শাস্ত্রে লেখা আছে এবং শ্রী ব্রহ্মাজী, শ্রী বিষ্ণুজী, শ্রী শিবজীর কোন মাতা পিতা নেই। এনারা তো অজন্মা-অজর-অবিনশ্বর এবং সর্বেশ্বর, মহেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়। সমস্ত সৃষ্টির রচনাকার, তিন গুন যুক্ত। ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাখা আরোপন করে রেখেছিলেন, যেটা এখনো পর্যন্ত ওরা বলে আসছেন। আজও ওই পবিত্র গ্রন্থগুলোই আমাদের কাছে আছে। যাতে তিন প্রভুর (রজগুণ শ্রী ব্রহ্মাজী, সত্ত্বগুণ শ্রী বিষ্ণুজী, তমগুণ শ্রীশিবজীর) মাতা পিতার স্পষ্ট বিবরন দেওয়া আছে। ওই সময় আমাদের পূর্বপুরুষরা বেশির ভাগই অশিক্ষিত ছিলেন আর শিক্ষিত বর্গের লোকেদের তো শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। তবুও কবীর পরমেশ্বরের (কবীর্দেবের) দ্বারা বলা সত্য জ্ঞানকে জেনে বুঝে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়েছিলেন যে, কবীর মিথ্যা কথা বলে, কোন শাস্ত্রে লেখা নেই যে, শ্রী ব্রহ্মাজী, শ্রী বিষ্ণুজী, আর শ্রী শিবজীর কোনো মাতা পিতা আছে।

কবীর সাহেব তিন দেবতার উৎপত্তির কথা শোনালেন ॥

আজ সমস্ত মানব সমাজে (ভাই, বোন, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, ছেলে, মেয়ে) সবাই শিক্ষিত। তাই এখন আর কেউ আমাদের ভ্রমিত করতে পারবে না যে, শাস্ত্রে এইরকম কিছু লেখা নেই, যেমনটি কবীর সাহেবের অমৃত বাণীতে, কবীর সাগর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে।

পূজ্য কবীর সাহেবের (কবির্দেবের) অমৃতবাণী :-

ধর্মদাস য়হ জগ বৌরানা। কোই জানে পদ নিরবানা॥
য়হি কারণ ম্যাঁয় কথা পসারা। জগসে কহিয় রাম নিয়ারা॥
য়হি জ্ঞান জগ জীব শুনাও। সব জীবোঁকা ভরম নশাও॥
ভরম গয়ে জগ বেদ পুরাণা। আদি রাম কা ভেদ ন জানা॥
রাম রাম সব জগত বখানে। আদি রাম কোই বিরলা জানে॥
জ্ঞানী শুনে সো হিরদৈ লগাই। মূর্খ শুনে সো গম্য না পাই॥
অব ম্যাঁয় তুমসে কহো চিতাই। ত্রয়দেবনকী উৎপত্তি ভাই॥
কুছ সংক্ষেপ কহোঁ গুহরাই। সব সংশয় তুম্হরে মিট জাই॥
মা অস্টঙ্গী পিতা নিরঞ্জন। বে জম দারুন বংশন অঞ্জন॥
পহিলে কীন্হ নিরঞ্জন রাই। পিছে সে মায়া উপজাই॥
মায়া রূপ দেখি অতি শোভা। দেব নিরঞ্জন তন মন লোভা॥
কামদেব ধর্মরায় সাতায়ে। দেবী কো তুরন্তহী ধর খায়ে।
পেট সে দেবী করি পুকারা। সাহেব মেরা করো উবরা॥
ঢের শুনি তব হুম তহী আয়ে। অষ্টাঙ্গী কো বন্দ ছুড়ায়ে॥
সতলোক মে কিন্হা দুরাচারি, কাল নিরঞ্জন দিন্হা নিকারি॥
মায়া সমেত দিয়া ভগাই, ষোলহ সঙ্খ কোষ দুরিপর আই॥
অষ্টাঙ্গী আর কাল অব দোই, মন্দকর্ম সে গয়ে বিগোই॥
ধর্মরায় কো হিকমত কিন্হা। নখ রেখা সে ভগকর লিন্হা॥
ধর্মরায় কিন্হা ভোগ বিলাসা। মায়া কো রহি তব আসা॥

তিন পুত্র অস্টাঙ্গী জায়ে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নাম ধরায়ে॥
তিনদেব বিস্তার চলায়ে। ইনমে য়হ জগ ধোকা খায়ে॥
পুরুষ গম্য কৈসে কো পাবৈ। কাল নিরঞ্জন জগ ভরমাবৈ॥
তীন লোক আপনে সুত দিন্হা। সুন্ন নিরঞ্জন বাসা লিন্হা॥
অলখ নিরঞ্জন সুন্ন ঠিকানা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভেদ ন জানা॥
তিন দেব সো উনকো ধাবেঁ। নিরঞ্জন কা বে পার না পাবেঁ॥
অলখ নিরঞ্জন বড়া বটপারা। তীন লোক জিব কীন্হ অহারা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নহী বচায়ে। সকল খায় পুন ঘূর উড়ায়ে॥
তিনকে সুত হ্যায় তীনোঁ দেবা। আন্ধর জীব করত হ্যায় সেবা।
অকাল পুরুষ কাহু নহি চীন্হা। কাল পায় সবহী গহ লীন্হাঁ॥
ব্রহ্ম কাল সকল জগ জানে। আদি ব্রহ্মকো না পহিচানে॥
তীনোঁ দেব ঔর ঔতারা। তাকো ভজে সকল সন্সারা॥
তীনোঁ গুণ কা য়হ বিস্তারা। ধর্মদাস ম্যায় কহোঁ পুকারা॥
গুন তীনোঁ কী ভক্তি মেঁ, ভূল পরো সন্সার।
কহৈ কবীর নিজ নাম বিনা, কৈসে উতরৈঁ পার॥

এরপর মহর্ষি সর্বানন্দজী চার বেদকে তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে বুঝলেন। আর স্বয়ং বাস্তবিকতার সঙ্গে পরিচিতও হলেন। কবীর জোলার শিষ্য হলেন আর এই সত্য জ্ঞান অন্যদেরকেও বোঝাতে লাগলেন।

উপরোক্ত বাণীর ভাবার্থ - কবীর পরমেশ্বরজী ১৩৯৮-১৫১৮ সাল পর্যন্ত সংসারে থেকে, নিজের পরম ভক্ত ওনার সমকালীন ধর্মদাসজীকে বলেছিলেন। (ধর্মদাসজীও শ্রী বিষ্ণুজী ওরফে শ্রী কৃষ্ণজীর পরম ভক্ত ছিলেন। পরে সত্য জেনে বুঝে কবীর পরমেশ্বরজীর শরণে চলে এসেছিলেন।) কবীরজী বললেন হে ধর্মদাস! এই সারা সংসার যথার্থ আধ্যাত্মিক জ্ঞান না থাকার জন্যে বিচলিত হয়ে আছে। কেউই মোক্ষ মার্গটাকে জানে না। সেইজন্য আমি তোমাকে এই কথা শোনালাম যে, পূর্ণ পরমাত্মা হলেন এই দেব-দেবী এবং কাল ব্রহ্ম থেকে অন্য। (এর প্রমান গীতার ১৫ নং অধ্যায়ের ১৬-১৭ নং শ্লোকে আছে।) হে ধর্মদাস! এই কথা তুমি জগতের জীব সকলকে শোনাও। তাদের বিভ্রান্তি দূর করো। এখন আমি (কবীরজী) তোমাকে তিন দেবতার (শ্রী ব্রহ্মাজী, শ্রী বিষ্ণুজী, আর শ্রীশিবজীর) - উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত কাহিনী শোনাব, তাতে তোমার সমস্ত বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবজীর মাতা দূর্গা দেবী আর পিতা জ্যোতি নিরঞ্জন অর্থাৎ কাল ব্রহ্ম। আমি (কবীরজী) প্রথমে জ্যোতি নিরঞ্জনকে (কাল ব্রহ্ম) উৎপন্ন করেছি। তারপর দুর্গা দেবীকে (অস্টাঙ্গী) উৎপন্ন করেছি। দুইজনকেই একেবারে যৌবনপ্রাপ্ত রূপে উৎপন্ন করেছিলাম। কিছুকাল অতিবাহিত হবার পরে জ্যোতি নিরঞ্জন দেবীর সৌন্দর্যে আকর্ষিত হয়ে দূর্গা দেবীর সঙ্গে ভোগ বিলাস (Sex) করে। তাতে মায়ার (দেবী দুর্গার) গর্ভ সঞ্চার হয়। অষ্টাঙ্গী দেবী তিন পুত্রের জন্ম দেয়। যাদের নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব রাখা হয়।

এই তিন পুত্র, তাদের পিতা কাল নিরঞ্জনের কাজ করছে। অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি, স্থিতি এবং সংহারের কাজ করছে। এই তিন দেবতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সমস্ত ভক্তগণ এদেরকে সর্বে-সর্বা ভগবান বলে মনে করে, এদেরই প্রশংসা এবং ভক্তি সাধনা করছে, যে কারণে তারা ধোঁকা খেয়ে যাচ্ছে। পূর্ণ পরমাত্মার জ্ঞান জীবেরা কি করে প্রাপ্ত করতে পারবে? এই কাল নিরঞ্জন সমস্ত জগতকে যে ধোঁকা দিয়ে রেখেছে। এই কাল এক ব্রহ্মাণ্ডের উপরে শূন্য স্থানে নিজের যোগমায়া দ্বারা লুকিয়ে থাকে।

নিজের বাস্তবিক রূপে কারো সামনে আসে না। (এর প্রমাণ গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ২৪ - ২৫ নং শ্লোকে আছে)। এই কাল প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন যে, আমি কখনো কাউকে দর্শন দেব না। এটাই আমার অনুত্তম (অতি নিকৃষ্ট বা অত্যন্ত খারাপ) অটল বিধান। এই কারনের জন্য শ্রী ব্রহ্মাজী, শ্রী বিষ্ণুজী, আর শ্রী শিবজী পরমাত্মা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধনা করেন। ওদেরও আজ পর্যন্ত পিতা কালের দর্শন হয়নি। এদেরও এই রহস্যের জ্ঞান নাই, যা আমি তোমাকে বলছি। এই কাল নিরঞ্জনকে অলখ নিরঞ্জনও বলা হয়। এ বড়ো বাটপার অর্থাৎ ধাপ্পাবাজ। এ দুর্গা দেবীর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। সেই কারনের জন্য এ অভিশাপ পেয়েছিল যে, প্রতি দিন এ এক লাখ মানব শরীর খাবে আর সওয়া লাখ উৎপন্ন করবে। এই কাল নিজের তিন পুত্র (শ্রী ব্রহ্মাজী, শ্রী বিষ্ণুজী, আর শ্রীশিবজী) কেও খায়। অর্থাৎ ওদেরও মারে (মৃত্যু প্রদান করে)। এদের (কাল এবং দেবী দুর্গার) তিনটি পুত্র। তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞানচক্ষু বিহীন ব্যক্তিরা এই তিন দেবতাকে অজর, অমর, অবিনশ্বর এবং সকলের মালিক মনে করে ধোঁকা খাচ্ছে।

অকাল পুরুষ অর্থাৎ যার কখনও কাল (নাশ) হয় না, ওই সত্য পুরুষকে কেউ জানে না। তাঁকে কেউ পরখ করে দেখে নাই। কাল অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ (নশ্বর) কে সকলে স্বীকার করে নিয়েছে। একেই সমস্ত জীব নিরাকার পরমাত্মা বলে জানে। কিন্তু আদি দিব্য পুরুষকে (গীতার ৮ নং অধ্যায়ের ৩ - ৪, ৯, ১০, ২০, ২১, ২২ নং শ্লোকে, ১৮ নং অধ্যায়ের ৬২, ৬৪ নং শ্লোকে এবং ১৫ নং অধ্যায়ের ১, ৪-১৬, ১৭ নং শ্লোকে বলা পূর্ণ পরমাত্মাকে) কেউ জানে না। সাধাসিধে ভোলাভালা প্রাণীরা এই তিন দেবতারই ভক্তি করেন আর এনাদের অবতারদের (রাম, কৃষ্ণ, প্রভৃতি) ভক্তিই সারা সংসার করছে যেটা পূর্ণমোক্ষদায়ক নয়।

কবীর পরমেশ্বরজী বলছেন, হে ধর্মদাস! তিন দেবতার এই হল বিস্তারিত বিবরণ। আমি ডেকে - ডেকে বলছি। সবাইকে শোনাচ্ছি। এই তিনগুণ অর্থাৎ রজগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু, তমগুন শিবের ভক্তিতে সমস্ত সংসার ভুলে ভটকে আছে। পূর্ণ পরমাত্মার নিজের নাম অর্থাৎ সত্য মন্ত্র ছাড়া এই ভবসাগর কিভাবে পার হতে পারবে?

কবীর, তিন দেব কী জো করতে ভক্তি, উনকি কবহু না হোবে মুক্তি॥

অর্থাৎ কবীর পরমেশ্বরজী বলেছেন এই তিন দেবতাদের (শ্রী ব্রহ্মাজী, শ্রী বিষ্ণুজী, শ্রী শিবজী) যাঁরা ভক্তি করেন তাদের কখনো মুক্তি হবে না। গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ১২, ১৫ নং শ্লোকে এবং ২০, ২৩ নং শ্লোকেও এই প্রমান আছে, যে সাধকদের জ্ঞান, তিন গুন অর্থাৎ রজগুন ব্রহ্মা, সত্ত্ব গুন বিষ্ণু, তম গুন শিব থেকে প্রাপ্ত ক্ষনিক লাভ পাওয়ার বদলে অপহৃত হয়েছে বা হরণ করে নেওয়া হয়েছে, সে রাক্ষস স্বভাব ধারন করা, মানুষদের মধ্যে নীচ, দুষিত কর্ম করা মূর্খ, আমার ভক্তিও করে না (গীতা জ্ঞান দাতা বলেছেন)। গীতা জ্ঞান দাতা ৭ নং অধ্যায়ের ১৮ নং শ্লোকে নিজের ভক্তিকেও অনুত্তম অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট বলেছেন। এটাই উপরে কবীর পরমেশ্বরজী নিজের তত্ত্বজ্ঞানে বলেছেন।

॥ গীতায় তিন দেবতার ভক্তি না করার প্রমান ॥

ধর্মদাসের ১৬ নং প্রশ্ন :- রজগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু এবং তমগুন শিবের পূজা করা কি উচিত?

জিন্দা বাবার উত্তর :- না।

ধর্মদাসের ১৭ নং প্রশ্ন :- রজগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু তমগুন শিবের পূজা করা যে উচিত নয়, তার কি প্রমান আছে?

জিন্দা বাবার উত্তর :- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৫ আর ২০ থেকে ২৩ নং শ্লোকে এবং ৯ নং অধ্যায়ের ২৩,২৪ নং শ্লোকে, গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৫ নং শ্লোকে প্রমান আছে, গীতা জ্ঞান দাতা বলছেন, যে ব্যক্তি রজগুন-ব্রহ্মাজী, সত্ত্বগুন- বিষ্ণুজী, ও তমগুন-শিবজীর ভক্তি করে, সে রাক্ষস স্বভাব ধারন কারী, মানুষের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর, দুষিত কর্ম করা মূর্খ, আমাকেও ভজনা করে না। (এর প্রমান গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৫ নং পর্যন্ত শ্লোকে আছে। আবার গীতার ৭ নং অধ্যয়ের ২০ থেকে ২৩ নং পর্যন্ত শ্লোকে এবং গীতার ৯ নং অধ্যায়ের ২৩-২৪ নং পর্যন্ত শ্লোকেও একই কথা বলেছে। আর ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ এবং পরম অক্ষর পুরুষের বিষয়ে বর্ণনা ১৫ নং অধ্যায়ের ১৬ - ১৭ নং শ্লোকে আছে) এদেরকে ছাড়া, শ্রী ব্রহ্মাজী, শ্রী বিষ্ণুজী আর শ্রী শিবজীকেও (অধ্যায় নম্বর ৭ এর শ্লোক ২০ তে আর অধ্যায় ৯ এর শ্লোক ২৩ এ "অন্য দেবতা" বলে সম্বোধন করা হয়েছে) অন্য দেবতাদের মধ্যে গোনা হয়। এই দুই অধ্যায়ে (গীতা অধ্যায়ের ৭ ও ৯ এ) লেখা শ্লোকে গীতার জ্ঞান দাতা বলেছেন, যে সাধক যে উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য দেবতাদের (ক্ষর, অক্ষর এবং পরম অক্ষর ছাড়া অন্য দেবতাদের) ভজনা করে (সাধনা করে) সে তাকে ভগবান বলে মনে করেই ভজনা করে। আমি ওই দেবতাদের কিছু শক্তি প্রদান করেছি। আমার বিধান অনুসারে দেবতাদের সাধনা করা সাধকদের কিছু লাভ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ওই অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন সাধকদের এই প্রাপ্ত ফল নষ্ট হয়ে যায়। দেবতাদের পুজা করা সাধক দেবলোকে চলে যায়। আমার পূজা করা সাধক আমাকে প্রাপ্ত করে।

গীতার ১৬ নং অধ্যায়ের ২৩ - ২৪ নং শ্লোকে বলেছেন, যে সাধক শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমর্জি আচরন করে, অর্থাৎ যেসব দেবী-দেবতা, পিতর (পিতৃ পুরুষ যারা পিতৃ লোকে আছে), যক্ষ, ভৈরব-ভূত ইত্যাদির পূজা করে এবং মনকল্পিত মন্ত্র জপ করে, তাদের না তো কোন সুখ প্রাপ্তি হয়, না কোন সিদ্ধি, না তাদের গতি অর্থাৎ মোক্ষ হয়। তাই তোর জন্য হে অর্জুন! কর্তব্য (যে ভক্তি করা উচিত) আর অকর্তব্যের (যে ভক্তি করা উচিত নয়) বিচার বিধান ব্যাবস্থায় ধর্মশাস্ত্রই প্রমান। গীতার ১৭ নং অধ্যায়ের ১ নং শ্লোকে, অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন হে কৃষ্ণ! (কেন না অর্জুন মনে করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণই গীতা জ্ঞান বলছেন, কিন্তু আসলে শ্রী কৃষ্ণের শরীরে প্রেতের মতো প্রবেশ করে কাল গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন যা পূর্বে প্রমানিত করা হয়েছে।)

যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে অন্য দেবী-দেবতাদের পূজা করে তার স্বভাব কেমন হয়?

উত্তরে গীতা জ্ঞানদাতা বলেছেন যে, সাত্ত্বিক (পূর্ব জন্মের কর্ম অনুসারে প্রাপ্ত) ব্যক্তি দেবতাদের পূজা করে। রাজসিক ব্যক্তি যক্ষ ও রাক্ষসদের পূজা করে আর তামসিক ব্যক্তিরা ভুত-প্রেত ইত্যাদির পুজো করে। এই সমস্ত পূজা শাস্ত্র বিধি রহিত পূজা বা কর্ম। আবার গীতার ১৭ নং অধ্যায়ের ৫ ও ৬ নং শ্লোকে বলেছেন, যে মানুষ শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে শুধু মনকল্পিত ঘোর তপ করে তপস্যা করে, সে দাম্ভিক (অহঙ্কারী) হয়, এদেরকে এদেরই শরীরের কমল গুলিতে বিরাজমান শক্তিদেরকে এবং আমাকেও কষ্ট প্রদানকারী, রাক্ষস স্বভাবের অজ্ঞানী বলে জানবে।

পরমেশ্বর কবির্দেব সুক্ষ বেদেও বলেছেন : -

কবীর, মাই মসানী সেঢ় শীতলা ভৈরব ভূত হনুমন্ত।
পরমাত্মা সে ন্যারা রহৈ, জো ইনকো পূজন্ত॥
রাম ভজৈ তো রাম মিলৈ, দেব ভজৈ সো দেব।
ভূত ভজৈ সো ভূত ভবৈ, সুনো সকল সুর ভেব॥

এখানে স্পষ্ট হল যে শ্রী ব্রহ্মাজী (রজগুন), শ্রী বিষ্ণুজী (সত্ত্ব গুন), শ্রী শিবজী (তম গুন) এদের পূজা করা উচিত নয় এবং তার সাথে সাথে ভূতদের, প্রেতদের (শ্রাদ্ধ করা, পিতৃ পুরুষদের তর্পণ করা, মৃত্যুর পর তেরো দিনের ক্রিয়াকর্ম, পিন্ডদান করা এইসবের মাধ্যমে ভূত প্রেতের পুজোই করা হয়) ভৈরব, হনুমানেরও পূজা করা উচিত নয়।

॥ "গীতা তোমার জ্ঞান অমৃত" পুস্তকের কিছু অংশ ॥

ধর্মদাসের ৪৪ নং প্রশ্ন :- পূর্ণ মোক্ষের জন্য কি ভগবান বিষ্ণু ও ভগবান শংকরের পূজা করা ছেড়ে দিতে হবে?

জিন্দা বাবার উত্তর : এই সমস্ত প্রভুদের ছাড়তে হবে না, কিন্তু এদের পূজা করা ছাড়তে হবে।

ধর্মদাসের ৪৫ নং প্রশ্ন :- হে জিন্দা বাবা! আমি বুঝতে পারছি না, এই বিষ্ণু, শংকর ভগবানদের ছাড়তে হবে না, কিন্তু এদের পূজা করা ছাড়তে হবে, মানে কি। আমার সংকীর্ণ বুদ্ধি, আমি মহা অজ্ঞানী প্রানী। কৃপা করে বিস্তারিত ভাবে ঝুঝিয়ে বলুন।

জিন্দা বাবার উত্তর :- হে ধর্মদাস! তুমি শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মনমর্জি আচরণ করছো। তাই তোমার এই সাধনাতে কোন লাভ হচ্ছে না। এই দেবতাদের থেকে লাভ পাওয়ার সাধনা মন্ত্র, একমাত্র আমার কাছে আছে। যেমন ধরো এক গবাদি পশু মোষ হয়, মোষকে মোষ - মোষ বলে ডাকতে থাক, ও তোমার ডাকে সাড়া দেবে না। কিন্তু ওর এক বিশেষ মন্ত্র হুরর-হুরর আছে। এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত হবে, আর যে আওয়াজ করে ডাকছে তার দিক লক্ষ্য করে আকর্ষিত হয়ে ছুটে চলে আসবে। এইরকমই এই সব আদরণীয় দেবতাদেরও নিজস্ব মন্ত্র আছে। সেইসব মন্ত্র জপ করলে (এদের পুজো নয় এদের সাধনা, মন্ত্র জপ দ্বারা উপার্জন) ওই দেবতারা শীঘ্র তোমাকে পূর্ণ লাভ দেবে।

প্রিয় পাঠকগণ! ওই মন্ত্রগুলো একমাত্র আমার (সন্ত রামপাল দাসের) কাছেই আছে, যা পরমেশ্বর কবীরজী গুরুজীর মাধ্যমে আমাকে দিয়েছেন। তাই সর্বসাধারনের কাছে প্রার্থনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে এসে এই অমূল্য মন্ত্র প্রাপ্ত করে নিজের জীবনকে ধন্য করুন।

যেমনটি আপনাদের বলেছিলাম যে এই সংসারকে একটি বৃক্ষ বলে জানুন। পরম অক্ষর পুরুষ এর মূল/শিকড়, কান্ড অক্ষর পুরুষ, কান্ড থেকে বের হওয়া মোটা ডাল ক্ষর পুরুষ, এবং মোটা ডাল থেকে যে তিনটি শাখা বা ডাল বের হয়েছে তারা তিন দেবতা (রজগুন ব্রহ্মাজী, সত্ত্বগুন বিষ্ণুজী, তমগুন শংকরজী) আর পাতারূপ সংসার।

যদি আপনি কোথাও থেকে একটি আমের চারা গাছ আনেন তো তাহলে প্রথমে মাটিতে গর্ত করে, গাছের শিকড়কে গর্তে রেখে, মাটি চাপা দিয়ে দেবেন আর গাছের গোঁড়ায় (শিকড়ে) নিয়মিত জল সেচ করবেন, তাহলে ধীরে ধীরে চারা গাছটা বড় হয়ে শাখা - প্রশাখায় ফল ধরা শুরু করবে। তাই গাছের শাখাগুলো কেটে ফেলা যাবে না। কিন্তু কখনোই গাছের শাখা প্রশাখাকে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে জল সেচ করা হয় না। ঠিক এই ভাবেই সংসার রূপী বৃক্ষের শিকড়/মূল অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ইষ্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত করে শাস্ত্র অনুসারে পূজা করলে পরম লাভদায়ক হয়। এই বিধিতে করা ভক্তি কর্মের ফল ওই তিন দেবতাই (সংসার রূপী বৃক্ষের শাখা) কর্ম অনুসারে প্রদান করে। তাই এদের পুজো করা ছাড়তে হয় কিন্তু এনাদের ত্যাগ (ছেঁটে ফেলা) করাও যাবে না। এরই প্রমান গীতার ৩ নং অধ্যায়ের ৮ থেকে ১৫ নং পর্যন্ত শ্লোকে আছে। বলেছেন যে :-

- ❖ হে অর্জুন! তুই শাস্ত্র বিধি অনুসারে কর্ম কর। অর্থাৎ শাস্ত্রে যেমন ভক্তি করতে বলা হয়েছে তদ্রুপ ভক্তি কর্ম কর। যদি তুই ঘর ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যাস অর্থাৎ তুই কর্ম সন্ন্যাসী হয়ে যাস বা এক স্থানে বসে হঠ যোগ সাধনা করতে থাকিস তাহলে তোর শরীর পোষনের নির্বাহ হবে না। এই জন্য কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করতে - করতে ভক্তি কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। (গীতার ৩ নং অধ্যায়ের ৮ নং শ্লোক)
- ❖ যে সাধকগণ শাস্ত্র বিধি ত্যাগ করে মন - মর্জী আচরণ করে অর্থাৎ শাস্ত্র অনুসার ভক্তি কর্ম না করে অন্য প্রকারের কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ থাকা জনসমুদয়, জন্ম - মৃত্যুর চক্রের বন্ধনে সর্বদা বাঁধা থেকে যায়। এই জন্য হে কুন্তি পুত্র অর্জুন! যারা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ভক্তি কর্ম করছে, তাদের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে তুই শাস্ত্র অনুসারে সাধনা কর। (গীতার ৩ নং অধ্যায়ের ৯ নং শ্লোক)
- ❖ সংসার রচনা করার পর প্রজাপতি (কুলের মালিক) সর্বপ্রথম মনুষ্যকে রচনা করেন, সেই সঙ্গে যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানের জ্ঞান দেবার সময় তাদের বলেছিলেন যে, তোমরা এইভাবে শাস্ত্রানুকূল কর্ম করে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই প্রকার শাস্ত্র অনুসারে করা ভক্তি তোমাদের ইচ্ছিত ভোগ প্রদানকারী হবে। (গীতার ৩ নং অধ্যায়ের ১০ নং শ্লোক)
- ❖ এই প্রকার শাস্ত্র অনুকুল ভক্তির দ্বারা অর্থাৎ সংসার রূপী বৃক্ষের শিকড়ে (মূল অর্থাৎ পরম অক্ষর ব্রহ্ম) জল সেচ করে অর্থাৎ পুজো করে দেবতাদের অর্থাৎ সংসার রূপী বৃক্ষের তিন গুন রূপী শাখাগুলোকে (রজগুন ব্রহ্মাজী, সত্ত্ব গুন বিষ্ণুজী, তমগুন শিবজীকে) উন্নত করো। ওই দেবতারা (সংসার রূপী বৃক্ষের শাখা) তোমাদের কর্ম অনুসার ফল প্রদান করে তোমাদের উন্নত করবে। এই ভাবে একে - অপরকে উন্নত করে পরম কল্যাণ অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। (গীতার ৩ নং অধ্যায়ের ১১ নং শ্লোক)
- ❖ শাস্ত্র বিধি অনুযায়ী করা ভক্তি কর্ম অর্থাৎ যজ্ঞ দ্বারা উন্নতি প্রাপ্ত দেবতাগণ অর্থাৎ সংসার রূপী বৃক্ষের মূল অর্থাৎ মূল মালিককে (পরম অক্ষর ব্রহ্মকে) ইস্ট রূপে প্রতিষ্ঠিত করে ভক্তি কর্ম থেকে বর্ধিত হওয়া শাখাগুলো (তিন দেবতা) তোমাদেরকে, না চাইতেও, কর্ম অনুসারে ইচ্ছিত ভোগ প্রদান করতে থাকবে। অর্থাৎ তোমরা না চাইলেও ফল প্রদান করবে। যেমন আমের গাছ লাগিয়ে গাছের গোঁড়ায় জল সিঞ্চন করতে থাকলে গাছ বড় হয়ে গেল এবং শাখা প্রশাখা উন্নত হয়ে গেল। তারপর ওই শাখায় আপনা আপনি এতো ফল ধরবে, যে একদিন ঝরে ঝরে পড়বে। নিজের কর্ম অনুসারে ব্যক্তি যে ধন প্রাপ্ত করে, তা উপরোক্ত বিধিতেই হয়। যদি কোন ব্যক্তি দেবতাদের (শাখাগুলোর) দেওয়া ধন পুনরায় দান - পূণ্যতে না লাগায় অর্থাৎ যে পুনরায় শাস্ত্র অনুকুল সাধনা, ধর্ম-কর্ম না করে, শুধুই নিজের পেট ভরে, স্বয়ংই ভোগ করতে থাকে, ওই ব্যক্তি তো পরমাত্মার চোর। (গীতার ৩ নং অধ্যায়ের ১২ নং শ্লোকে)
- ❖ শাস্ত্র অনুসারে ভক্তি বিধিতে সর্ব প্রথম পরমাত্মাকে ভোগ লাগানো হয়। ভান্ডারা করানো হয়। প্রথমে পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ইস্ট রূপে পূজো করার পর, ভোগ লাগানোর পর অবশিষ্ট অন্ন সমস্ত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ওই অবশিষ্ট অন্ন সৎসঙ্গে উপস্থিত পুণ্য আত্মারাই খায়। কেন না পুণ্য আত্মারাই পরমাত্মার জন্য সংসারিক কাজ-কর্মের ভিতর থেকে সময় বের করে, সৎসঙ্গে আসে বা ধার্মিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করে। এই জন্য বলেছেন যে, ওই যজ্ঞের পরিশিষ্ট বা বেঁচে যাওয়া অন্ন যে সমস্ত সন্ত জন খায় তারা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যেসব মূর্খ বা পাপী লোকেরা তত্ত্বদর্শী সন্তের সৎসঙ্গে যায় না, তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান হয় না। ওই

পাপী আত্মারা নিজেদের শরীর পোষণ করার জন্যই অন্ন ব্যঞ্জন বানায়, তারা পাপই খায়, কারণ সন্ত ভক্তজন প্রথমে পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ভোগ লাগায়। তাতে সারা ভোজন পবিত্র প্রসাদ হয়ে যায়। যাঁরা এই রূপ করে না, তারা পরমাত্মার চোর। ভগবানকে ভোগ না লাগানো ভোজন (অন্ন ব্যঞ্জন বা খাবার) পাপের ভোজন হয়। এই জন্য বলা হয়েছে, যাঁরা ধর্ম - কর্ম শাস্ত্র অনুসারে করে না, তারা পাপের ভাগী হয়। (গীতার ৩ নং অধ্যায়ের ১৩ নং শ্লোক)

- ❖ সম্পূর্ণ প্রানী অন্নের ভিত্তিতে উৎপন্ন হয়। অন্ন বর্ষার ভিত্তিতে উৎপন্ন হয়। বর্ষা যজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্র অনুকুল ধার্মিক অনুষ্ঠান থেকেই হয়। যজ্ঞ অথাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠান শাস্ত্র অনুসারে করা কর্ম দ্বারা হয়। (গীতার ৩ নং অধ্যায়ের ১৪ নং শ্লোকে)।
- ❖ কর্ম তো ব্রহ্ম অর্থাৎ ক্ষর পুরুষের থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। কারন সমস্ত প্রাণী সনাতন পরমধামে যেখানে থাকত, সেখানে কর্ম ছাড়াই সমস্ত সুখ এবং পদার্থ উপলব্ধ ছিল। সেখান থেকে সমস্ত প্রাণীরা নিজেদের ভুলের জন্য ক্ষর পুরুষের সঙ্গে এখানে এসে ফেঁসে গিয়েছে। এখানে সবার কর্ম অনুসারে ফল প্রাপ্ত হয়। এখানে কর্ম করেই জীবন নির্বাহ করতে হয়। এই জন্য বলেছেন কর্ম ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ) থেকে উৎপন্ন জেনো, আর ব্রহ্ম অবিনাশী পরমাত্মা থেকে উৎপন্ন জানবে। এই প্রমাণটি অথর্ববেদের কান্ড নং ৪ অনুবাক নং ১ মন্ত্র নং ৩ এ তেও আছে, "ব্রহ্ম ব্রহ্মণঃ উজ্জভার" অর্থাৎ (ব্রহ্মণঃ) সচিদানন্দ ঘন ব্রহ্ম = পরম অক্ষর পুরুষ, ব্রহ্মকে (উজ্জভার) উৎপন্ন করেছেন।

বিঃদ্রঃ- গীতার ৩ নং অধ্যায়ের ১৪ নং শ্লোকে "অক্ষর" শব্দের অর্থ অবিনাশী পরমাত্মা সঠিক। কিন্তু যেখানে ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও পরম অক্ষর পুরুষের বর্ণনা আছে, সেখানে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষকে নশ্বর (নাশবান) বলা হয়েছে। ওখানে জায়গা বিশেষে অক্ষর এর অর্থ ওটাই ঠিক আছে। গীতার ১৫ নং অধ্যায়ের ১৬-১৭ নং শ্লোকে অক্ষর শব্দের অর্থ অবিনাশী পরমাত্মা হবে না, কারন সৃষ্টি রচনাতে প্রমানিত হয়েছে যে সত্ পুরুষ (অবিনাশী পরমাত্মা) থেকে ব্রহ্মের সৃষ্টি হয়েছে। এতে প্রমানিত হয় যে সর্বগতম্ ব্রহ্ম অর্থাৎ যে পরমাত্মার ব্যাপ্তি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গুলিতে সব জায়গায় বিদ্যমান, তিনিই সকলের মালিক। ওই পরমাত্মা সর্বদা যজ্ঞ অর্থাৎ ধার্মিক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ভাবার্থ এই যে, পরম অক্ষর ব্রহ্মকে ইস্টদেব রূপে প্রতিষ্ঠিত করে ধার্মিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ যজ্ঞ করলে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভক্তি কর্ম করলে সেই সাধক অবশ্যই লাভ প্রাপ্ত করে, তার ফলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন সংসার রূপী বৃক্ষের চিত্র :–

এখানে গাছের ডালগুলিকে (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু, তমগুণ শিব) মাটিতে গর্ত করে রেখে দেখানো হয়েছে যে যারা এই তিন দেবতাদের মধ্যে যে কারোরই পুজো করে তারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে মনমর্জি আচরণ করে, যা গীতার ১৬ নং অধ্যায়ের ২৩ - ২৪ নং শ্লোকে অনুচিত বা ব্যর্থ বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে, সর্বগতম্ ব্রহ্মকে (পরম অক্ষর ব্রহ্মকে) ইষ্ট রূপে পুজা করে না, সেই সাধকের সমস্ত পূজা বা সাধনা ব্যর্থ। কারন গাছের ডালে (শাখায়) জলসেচ করতে থাকলে গাছ নষ্ট হয়ে যায়। গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৫, ২০ - ২৩ নং শ্লোক এবং ৯ নং অধ্যায়ের ২৩ - ২৪ নং শ্লোকে অন্য দেবী দেবতাদের পূজো করতে নিষেধ করেছে। (ধর্মদাসের ১৭ নং প্রশ্নের, জিন্দা বাবার উত্তর পড়ুন)

দেখুন এই পুস্তিকার **২২** নম্বর পাতার উল্টো করে লাগানো বৃক্ষের চিত্র, যা শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা। **২৩ নম্বর পাতার চিত্রে দেখুন** সোজাভাবে লাগানো বৃক্ষ যা শাস্ত্র অনুসারে সাধনা, যা মোক্ষদায়ক। এটারই প্রমান গীতা গ্রন্থে রয়েছে।

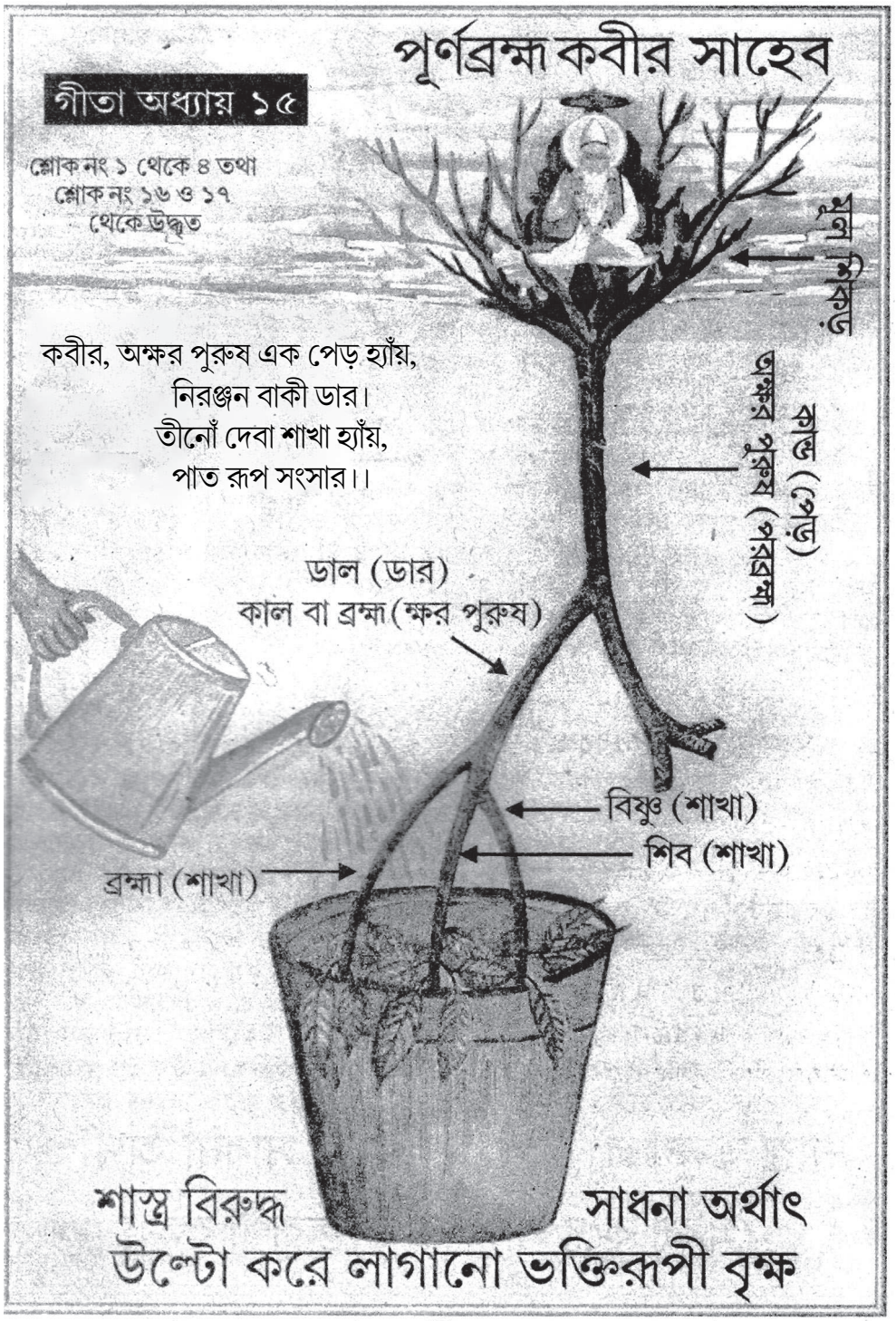
পূর্ণব্রহ্ম কবীর সাহেব
গীতা অধ্যায় ১৫
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ তথা
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
কবীর, অক্ষর পুরুষ এক পেড় হ্যাঁয়,
নিরঞ্জন বাকী ডার।
তীনোঁ দেবা শাখা হ্যাঁয়,
পাত রূপ সংসার।।
ডাল (ডার)
কাল বা ব্রহ্ম (ক্ষর পুরুষ)
বিষ্ণু (শাখা)
শিব (শাখা)
ব্রহ্মা (শাখা)
শাস্ত্র বিরুদ্ধ সাধনা অর্থাৎ
উল্টো করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ

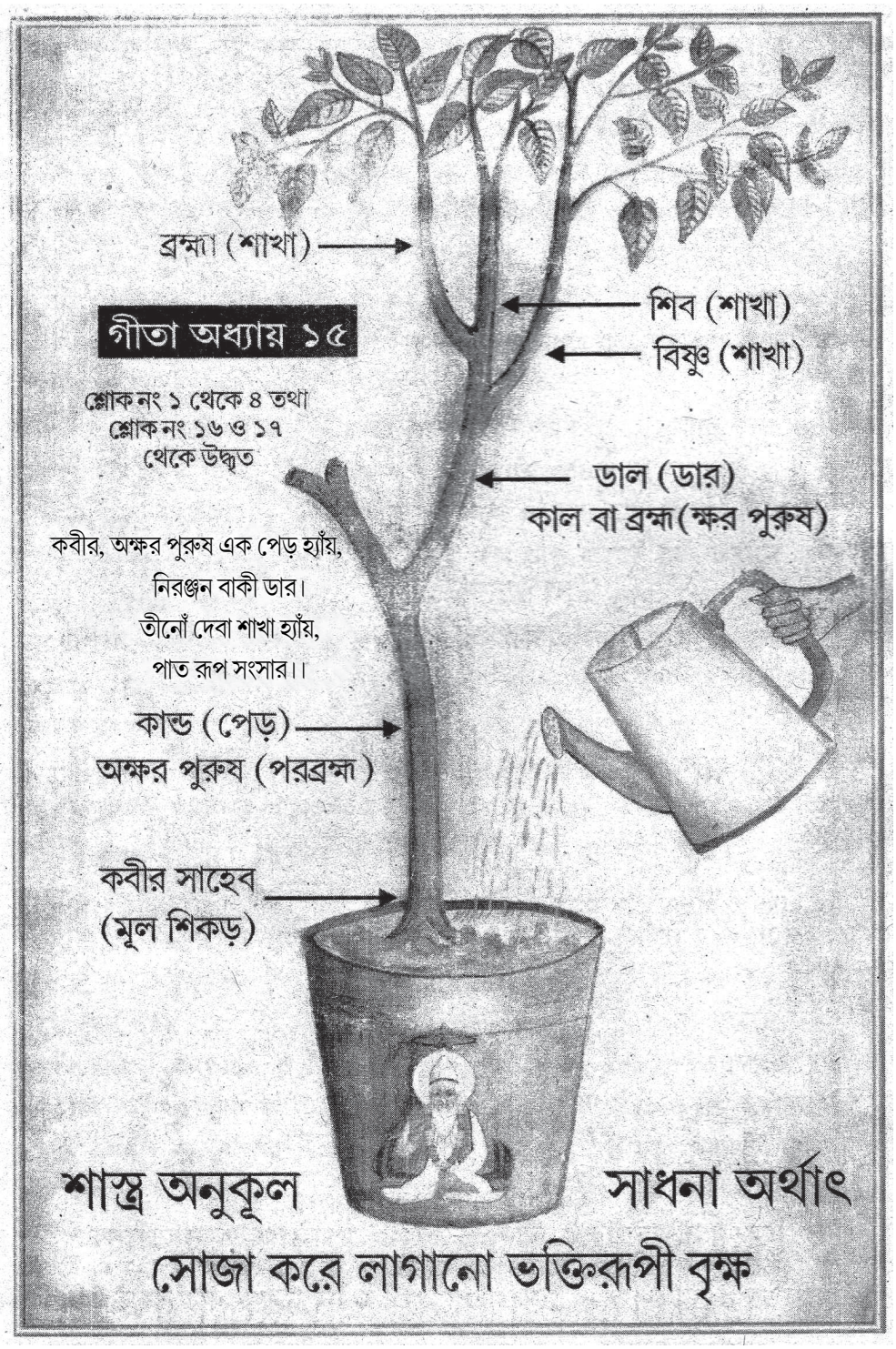
ব্রহ্মা (শাখা)
শিব (শাখা)
বিষ্ণু (শাখা)
গীতা অধ্যায় ১৫
শ্লোক নং ১ থেকে ৪ তথা
শ্লোক নং ১৬ ও ১৭
থেকে উদ্ধৃত
ডাল (ডার)
কাল বা ব্রহ্ম(ক্ষর পুরুষ)
কবীর, অক্ষর পুরুষ এক পেড় হ্যাঁয়,
নিরঞ্জন বাকী ডার।
তীনোঁ দেবা শাখা হ্যাঁয়,
পাত রূপ সংসার।।
কান্ড (পেড়)
অক্ষর পুরুষ (পরব্রহ্ম)
কবীর সাহেব
(মূল শিকড়)
শাস্ত্র অনুকূল
সাধনা অর্থাৎ
সোজা করে লাগানো ভক্তিরূপী বৃক্ষ

হে ধর্মদাস! এই জন্যই শ্রী ব্রহ্মাজী, শ্রী বিষ্ণুজী, শ্রী শিবজীকে ছাড়তে হবে না। ইষ্ট রূপে এদের পূজো করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম, যা তুমি করছো সেটা ছাড়তে হবে। তবেই ভক্ত বা সাধকের পূর্ণ মোক্ষ সম্ভব হবে।

ধর্মদাসের ৪৬ নং প্রশ্ন :- হে জিন্দা বাবা! আপনি তিন দেবতাদের (রজগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু ও তম গুন শিবজী) ভক্তি করা ব্যক্তিদের দশা তো শ্রীমৎভগবত গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৫, ২০ - ২৩ নং শ্লোকে এবং ৯ নং অধ্যায়ের ২৩ - ২৪ নং শ্লোক থেকে প্রত্যক্ষ (সরাসরি) প্রমান করে দিয়েছেন। ওখানে বলেছেন যারা তিন গুনের (রজগুন ব্রহ্মা, সত্ত্বগুন বিষ্ণু ও তম গুন শিব) ভক্তি করে, তাঁদের স্বভাব রাক্ষসদের মতো হয়, তারা মানুষের মধ্যে নীচ, দূষিত কর্মকারী (খারাপ কর্ম), এই মুর্খরা আমাকেও (গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্মাকে) ভজে না। অন্য দেবতাদের ভক্তি পূজা করা সাধকদের সুখের সময় (স্বর্গ ভোগ) 'সাময়িক' (ক্ষনিক) হয়। স্বর্গ সুখ ভোগ করে শীঘ্রই আবার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহন করে। হে মহাত্মাজী! এই সংসারে ঘটে যাওয়া এমন কোনো ঘটনা শোনান, যাতে আপনার এই বর্ণিত কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিন দেবতাদের ভক্তরা বা ওদের ভজন পুজন করা ব্যাক্তিরা এমন উৎপীড়ন নিপীড়ন করে।

॥ হিরণ্যকশিপুর কথা ॥

উত্তর (জিন্দা জগদীশ কবীর পরমাত্মার) :-

১. রজগুণ ব্রহ্মার উপাসকের চরিত্র :- হিরণ্যকশিপু নামক এক ব্রাহ্মণ রাজা ছিল। কোন এক কারনে ভগবান বিষ্ণুর (সত্ত্বগুণ) প্রতি তাঁর মনে ইর্ষার সৃষ্টি হয়। ওই রাজা কঠোর ভক্তি সাধনা করে রজগুণ ব্রহ্মাজীকে প্রসন্ন করে। ব্রহ্মাজী বলেন, হে পুজারী! বলো তুমি কি চাও? হিরণ্যকশিপু বর চেয়েছিল যে, আমার মৃত্যু যেন সকালে না হয়, না সন্ধ্যায়, না বাইরে হয়, না ভিতরে, না দিনে, না রাতে, না তো বারো মাসে, না আকাশে মৃত্যু হয়, না মাটিতে, না মানুষের হাতে, না পশু পাখীর হাতে মৃত্যু হয়। ব্রহ্মাজী বলেন, তথাস্তু। এই বর প্রাপ্ত করার পরে হিরণ্যকশিপু নিজেই নিজেকে অমর বলে মনে করে নেয়। আর সে প্রজাদের তার নিজের নাম, মন্ত্র হিসাবে জপ করার আদেশ দেয়। যদি কেউ বিষ্ণুর নাম জপ করতো তাহলে তার উপর অত্যাচার করে তাকে মেরে ফেলতো। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, শ্রী বিষ্ণুজীর ভক্তি করতো। হে ধর্মদাস! প্রহ্লাদকে যে কতো কষ্ট দিয়েছিল, সে সব কথার সঙ্গে তুমি তো ভালো ভাবেই পরিচিত। এর ভাবার্থ হল যে, রজগুন ব্রহ্মার ভক্ত হিরণ্যকশিপু রাক্ষস বলে পরিচিত হয়েছে, এই অত্যাচারী রাজার বড় বেদনাদায়ক ভাবে কুকুরের মত মৃত্যু হয়েছিল।

॥ রাবণ এবং ভস্মাসুরের কথা ॥

২. তমগুণ শিবজীর ভক্তদের চরিত্র :- লঙ্কার রাজা রাবণ তমগুণ শিবের ভক্তি করেছিল। সে নিজের সিদ্ধি শক্তিতে ৩৩ কোটি দেবতাদের বন্দি বানিয়ে রেখেছিল। তারপর দেবী সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে লঙ্কায় রেখে দেয়। হে ধর্মদাস! রাবণের যে কি হাল হয়েছিল, তা আমরা সকলে ভালো করেই জানি। তমগুণ শিবের উপাসক রাবণও রাক্ষস বলে কথিত আছে, তার সর্বনাশ হয়। সে নিন্দার পাত্র হয়।

- **অন্য উদাহরণ :-** ভস্মাসুরের কথা তো তুমি শুনেই রেখেছো। সে তমগুন শ্রী শিবজীর উপাসনা করতো। সে ১২ বৎসর ধরে তমগুণ শ্রী শিবজীর দরজার সামনে, উপর দিকে পা, নিচের দিকে মাথা (শীর্ষাসন) করে কঠোর ভক্তি তপস্যা করছিল। এক দিন দেবী পার্বতীজী বলেন হে মহাদেব! আপনি তো সক্ষম। আপনার ভক্ত কি চায়? একে বর প্রদান করুন প্রভু। ভগবান

শিব ভষ্মাগিরিকে জিজ্ঞাসা করেন, বলো ভক্ত! তোমার কি চাই? আমি তোমার তপস্যায় অতি প্রসন্ন হয়েছি। ভষ্মাগিরি বলে প্রথমে আপনি প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হোন, তারপর বর চেয়ে নেব। ভগবান শিব প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়ে গেলেন। তখন ভষ্মাগিরি বলে আপনার কাছে যে ভষ্মাকঙ্গণ (ভস্মাকড়া বা ভস্মাবালা) আছে, ওই ভষ্মাকঙ্গণ (ভস্মাকড়া বা ভস্মাবালা) আমাকে প্রদান করুন। প্রভু শিবজী ভষ্মাগিরিকে ভষ্মাকড়া দিয়ে দেন। ভষ্মাকড়া হাতে পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ভষ্মাগিরি বলে, শিবজী সাবধান হোন! এবার আপনাকে ভষ্ম করবো আর পার্বতীকে আমার নিজের স্ত্রী বানবো। এই বলে ভষ্মাগিরি অভদ্র ভাবে হাসতে থাকে আর শিবজীকে মারার জন্য তাড়া করে। ভগবান শিবজী দুষ্ট ভষ্মাগিরির উদ্দেশ্য তখন বুঝতে পেরে দৌড়ে পালাতে লাগলেন। পিছে-পিছে পূজারী মারার জন্য তাড়া করছে আর আগে-আগে ইষ্টদেব শিবজী মৃত্যুভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছেন।

বিচার করে দেখ ধর্মদাস্! যদি ওই শ্রী শিব ভগবান অবিনশ্বর (অবিনাশী) হতেন তাহলে মৃত্যুর ভয়ে কেন দৌড়াচ্ছিলেন। তোমরা এনাকে অবিনাশী বলো। তোমরা এনাকে অন্তর্যামীও বলো। যদি শিবজী অন্তর্যামী হতেন তাহলে ভষ্মাগিরির মনের নোংরা ভাবনার কথা আগেই জানতে পারতেন। এর থেকে প্রমানিত হয়ে গেলো ইনি তো অন্তর্যামীও নন।

যে সময় ভগবান শিবজী আগে - আগে দৌড়াচ্ছিলেন আর ভষ্মাগিরি পিছনে-পিছনে তাড়া করছিল, তখন ভগবান শিব নিজের রক্ষার্থে পরমেশ্বরকে ডাকতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ "পরম অক্ষর ব্রহ্ম"জী পার্বতীর রূপ ধারণ করে দুষ্ট ভষ্মাগিরির সামনে প্রকট হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে ভষ্মাগিরি! এসো আমার কাছে একটু বসো। ভষ্মাগিরি জানতো ভগবান শিবজী এখন আর তার কাছাকাছি আসবেন না। ভষ্মাগিরি তো এই যতসব উপদ্রব দৌরাত্ম্য পার্বতীকে পাওয়ার জন্যই করছিল। হে ধর্মদাস! এই সমস্ত কথা তুমি ভালো ভাবেই জানো। পার্বতী রূপে পরমাত্মা ভষ্মাগিরিকে "গন্ডহস্ত নৃত্য" - নাচিয়ে ভষ্ম করেছিলেন। তমগুনের পূজারী ভষ্মাগিরি তার নিজের খারাপ কর্মের জন্য ভস্মাসুর বা ভষ্মা রাক্ষস নামে কথিত হয়।

এই জন্য এই তিন দেবতার পূজারীদেরকে রাক্ষস স্বভাব ধারন করা, মানুষদের মধ্যে নীচ, দুষিত কর্ম করা মুর্খ বলা হয়েছে।

॥ হরিদ্বারে সাধুদের গণহত্যা ॥

৩. এবার সত্ত্বগুন শ্রী বিষ্ণুজির পূজারীদের কথা শোনাচ্ছি।

- ❖ এক সময় হরিদ্বারে হর কি পৌড়িতে বিশাল কুম্ভমেলা বসেছিল। ওই উপলক্ষ্যে তিন গুনের উপাসকরা নিজেদের-নিজেদের সম্প্রদায়ে একত্রিত হয়ে গিয়েছিল। গিরি, পুরি, নাগা-নাথ এরা হলেন সবাই তমগুন ভগবান শিবের উপাসক আর বৈষ্ণবগন হলেন সত্ত্বগুন ভগবান শ্রী বিষ্ণুর উপাসক। হর কি পৌড়িতে প্রথম স্নান করার জন্য দুই সম্প্রদায় নাগা আর বৈষ্ণবদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ২৫ হাজার ত্রিগুনের (রজগুণ ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ বিষ্ণু আর তমগুম শিবজি) পূজারী নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মারা গিয়েছিল। গনহত্যা করে দিয়েছিল। তরোয়াল, ছুরি, কাটারি দিয়ে একে অন্যের প্রাণ নিয়ে নিয়েছিল। তাই সুক্ষম্ বেদে বলেছেন :-

তীর তুপক তলবার কটারী, যমঘড় জোর বধাবৈ হ্যাঁয়।
হর প্যারী হর হেত নহী জানা, বহাঁ জা তেগ চালাবৈ হ্যাঁয়।
কাটৈ শীশ নহীঁ দিল করুণা, জগ মেঁ সাধ কহাবৈ হ্যাঁয়।
জো জন ইনকে দর্শন কুঁ যাবৈ, উনকো ভী নরক পাঠাবৈ হ্যাঁয়।

হে ধর্মদাস! উপরোক্ত সত্য ঘটনা থেকে প্রমানিত হয় যে রজগুন ব্রহ্মাজী, সত্ত্বগুন বিষ্ণুজী আর তমগুন শিবজীর পূজারীদেরকে গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ১২ থেকে ১৫ নং পর্যন্ত শ্লোকে রাক্ষস স্বভাব ধারণকারী, মানুষদের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর, দূষিত কর্মকারী মূর্খ বলা হয়েছে।

❖ জিন্দা রূপধারী পরমেশ্বরের মুখ কমল থকে উপরোক্ত কথা শুনে ধর্মদাসের মাথা যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল, আর ঘুরতে লাগল। সাহস করে ধর্মদাস বললেন হে প্রভূ! আপনি আমার মতো এক জ্ঞানান্ধকে জ্ঞানচক্ষু দান করেছেন দাতা। উপরোক্ত এই সমস্ত কথা আমরা শুনতাম এবং পড়তাম, কিন্তু কক্ষনো বিচারবোধ আসেনি যে আমরা ভুল পথে চলছিলাম। আপনাকে শত শত ধন্যবাদ। আপনি আমার মত নীচ অপরাধী পাপী আত্মাকে ঘোর নরক থেকে বের করে আনলেন প্রভু।

ধর্মদাসের ৪৭ নং প্রশ্ন :- হে জিন্দা মহাত্মা বাবা! আপনি যা বলেছেন এবং নিজের চোখে গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ১৮ নং শ্লোকে দেখেছি এবং পড়েছি যে, ওখানে গীতা জ্ঞান দাতা ব্রহ্ম নিজের সাধনার ফলে প্রাপ্ত গতিকে অনুত্তম্ অর্থাৎ নিকৃষ্ট বা অতি খারাপ বলেছেন। এই বিষয়টাও কৃপা করে এই রকম কোন উদাহরণ দিয়ে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিন। দয়া করে কোন কথা বা প্রাসঙ্গিক কাহিনী শোনান।

জিন্দা বাবার উত্তর :- গীতার ২ নং অধ্যায়ের ১২ নং শ্লোক, গীতার ৪ নং অধ্যায়ের ৫ ও ৯ নং শ্লোকে, গীতার ১০ নং অধ্যায়ের ২ নং শ্লোকে গীতা জ্ঞান দাতা (ব্রহ্ম) বলছে হে অর্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে। তুমি জানো না আমি জানি। শ্রীমদ্ভগবত্ গীতার ১৫ নং অধ্যায়ের ৪ নং শ্লোকে বলা হয়েছে তত্ত্বদর্শী সন্তের কাছ থেকে তত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্তি করার পরে পরমেশ্বরের ওই পরম পদের খোঁজ করা দরকার, যেখানে যাওয়ার পরে সাধক পুনরায় ঘুরে আর কখনো এই সংসারে ফিরে আসে না। যে পরমেশ্বর থেকে এই সংসার রূপী বৃক্ষের উৎপত্তির বিস্তারলাভ হয়েছে, অর্থাৎ যে পরমেশ্বর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেছেন, সেই পরমেশ্বরের ভক্তি করো। আবার গীতার ১৮ নং অধ্যায়ের ৬২ নং শ্লোকে গীতা জ্ঞান দাতা বলেছেন হে অর্জুন! তুই সর্বত ভাবে ওই পরমেশ্বরের শরণে যা, ওই পরমেশ্বরের কৃপাতেই তুই পরম শান্তি এবং সনাতন পরমধামকে প্রাপ্ত হবি। হে ধর্মদাস! যত দিন জন্ম-মৃত্যু থাকবে, ততদিন পরম শান্তি হতে পারে না, আর না তো সনাতন পরমধামকে প্রাপ্ত হতে পারে। বাস্তবে পরমগতি তাকেই বলা হয়, যেখানে সাধকের জন্ম - মৃত্যু চিরকালের জন্য সমাপ্ত হয়ে যায়। যেটা ব্রহ্ম সাধনার দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। এই জন্য গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ১৮ নং শ্লোকে গীতা জ্ঞান দাতা বলেছেন, যেসব জ্ঞানী আত্মা রয়েছে, আমার বিচারে তারা সবাই ভালো। কিন্তু এরা সবাই আমার অনুত্তম্ (নিকৃষ্ট - খারাপ) গতিতে লীন (সংলগ্ন) আছে। কারন তারা আমার (ব্রহ্মের) ভক্তি করছে। ব্রহ্ম সাধনার এক মাত্র মন্ত্র "ওঁম"। এই মন্ত্র জপ করলে ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি হয়। গীতার ৮ নং অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোকে স্পস্ট ভাবে বলেছেন, ব্রহ্ম লোকে যাওয়া সাধকও পুনরায় এই সংসারে ফিরে আসে। তাহলে কি ওই ভক্তদের পরম শান্তি হতে পারে না বা সনাতন পরম ধাম প্রাপ্তি হতে পারে না? বেদে বর্ণিত বিধিতে সাধনা করলে পরমাত্মা প্রাপ্তি হয় না, কিছু সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়ে যায়। এই সিদ্ধির দ্বারা ঋষি -

মুনিরা কিছু চমৎকার দেখিয়ে জনতার হানি ঘটিয়ে বিখ্যাত হয়ে যায়। এর ফলে শেষে সিদ্ধি সমাপ্ত করে, পাপের ভাগী হয়ে পুনরায় চুরাশি লক্ষ প্রাণীর শরীরে কষ্ট ভোগ করতে থাকে। এই জন্য ব্রহ্ম সাধনায় হওয়া গতিকে অথবা উপলব্ধিকে অতীব খারাপ বা অনুত্তম্ বলেছেন।

॥ চুনক ঋষি দ্বারা মান্ধাতা চক্রবর্তী সম্রাটের বিনাশের কথা ॥

- **কথা প্রসঙ্গ :** গীতা জ্ঞান দাতা (ব্রহ্ম) গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ১৬ - ১৭ নং শ্লোকে বলেছেন, আমার ভক্তি চার প্রকারের ভক্তরা করে। ১: আর্ত (সঙ্কট নিবারনের জন্য) ২. অর্থার্থী (ধন লাভের জন্য) ৩. জিজ্ঞাসু (যারা জ্ঞান প্রাপ্ত করে বক্তা হয়ে যায়)। ৪. জ্ঞানী (যারা শুধু মোক্ষ প্রাপ্ত করার জন্য ভক্তি করে)। এখানে গীতা জ্ঞান দাতা বলেছেন, এদের মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের ভক্তদের ছেড়ে দিয়ে চতুর্থ নং (জ্ঞানীদের) তার নিজের পাক্কা ভক্ত বলেছেন।

- **জ্ঞানীর বিশেষত্ব :** জ্ঞানী সে হয়, যে জানতে পেরে গেছে মনুষ্য জীবন কেবলমাত্র মোক্ষ প্রাপ্তির জন্যই প্রাপ্ত হয়। তার এটাও জ্ঞান থাকে যে পূর্ণ মোক্ষের জন্য কেবলমাত্র এক পরমাত্মার ভক্তি করা উচিত। অন্য দেবতাদের (রজগুন ব্রহ্মাজী, সত্ত্ব গুন বিষ্ণুজী ও তম গুন শিবজী) ভক্তিতে পূর্ণ মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। ওই জ্ঞানী আত্মারা, গীতার ৪ নং অধ্যায়ের ৩৪ নং শ্লোকে এবং যর্জুবেদের ৪০ নং অধ্যায়ের ১০ নং মন্ত্রে বর্ণীত তত্ত্বদর্শী সন্ত না মেলার কারণে, ওনারা স্বয়ং নিজে থেকেই বেদের নিষ্কর্ষ বের করে নিয়েছেন যে, ব্রহ্মই সর্বসক্ষম পরমাত্মা, আর তাঁর ভক্তি করার একমাত্র মন্ত্র "ওঁম" (ॐ)। এই মন্ত্র সাধনায় ব্রহ্ম লোকের প্রাপ্তি হয়। এটাই হল মোক্ষ।

- জ্ঞানী আত্মাগন পরমাত্মা প্রাপ্তির জন্য হটযোগ করতো। এক স্থানে বসে কঠোর তপ করতো এবং ওম্ (ॐ) মন্ত্র জপ করতো, কিন্তু গীতা বা বেদে এই হঠ যোগ করা বা এক স্থানে বসে বা দাঁড়িয়ে ঘোর তপ করা সাধককে মূর্খ, অভিমানী ও রাক্ষস বলেছেন। (গীতার ৩ নং অধ্যায়ের, ৪ থেকে ৯ নং শ্লোকে, গীতার ১৬ নং অধ্যায়ের ১৭ থেকে ২০ নং শ্লোকে, গীতার ১৭ নং অধ্যায়ের ১ থেকে ৬নং শ্লোকে)।

- এনাদের হঠ যোগের প্রেরনা কোথা থেকে এলো? শ্রী দেবী পুরাণের (গীতা প্রেস গোরখপুর থেকে প্রকাশিত সচিত্র মোটা টাইপ) তৃতীয় স্কন্দে লেখা আছে যে, ব্রহ্মাজী নিজের পুত্র নারদকে বলেছেন যখন আমার উৎপত্তি হয়, তখন আমি নিজেকে পদ্মফুলের উপর বসে থাকতে দেখতে পাই। আকাশবাণী হল যে তপস্যা করো - তপস্যা করো। তখন আমি এক হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলাম।

হে ধর্মদাস! রজগুণ ব্রহ্মাজী বেদ তো অনেক পরে, সাগর মন্থনের সময় পেয়েছিলেন। এটা যখন পড়লেন তখন যজুর্বেদের ৪০ নং অধ্যায়ের ১৫ নং মন্ত্রে ওম্ (ॐ) মন্ত্র দেখতে পেলেন। এই ওম্ মন্ত্রের জপ এবং আকাশবাণীতে প্রাপ্ত হঠ যোগের (ঘোর তপের) নির্দেশ, এই দুটি কথাকে মেনে নিয়ে সম্মিলিত ভাবে ব্রহ্মাজী স্বয়ং অভ্যাস করতে শুরু করেন, এবং পরে নিজের সন্তানদেরকেও (ঋষিদেরকেও) করতে বলেন। (চার বেদ এবং চার বেদের সারাংশ শ্রীমদ্ভগবত গীতায় হঠ যোগ করে ঘোর তপ করা ব্যক্তিদেরকে রাক্ষস, ক্রুর কর্মী, নরাধম অর্থাৎ নীচ ব্যক্তি বলেছেন। প্রমান রয়েছে

গীতার ১৬ নং অধ্যায়ের ১৭ – ২০নং শ্লোকে এবং গীতার ১৭ নং অধ্যায়ের ১ - ৬ নং শ্লোকে)। ওই সাধনাই জ্ঞানী আত্মা, ঋষিগনও করা শুরু করেন। ওই জ্ঞানী আত্মাদের মধ্যে একজন ছিলেন চুণক ঋষি, তার প্রসঙ্গ শোনাচ্ছি, যাতে তুমি তোমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে যাবে :- চুণক নামের এক ঋষি ছিলেন। তিনি ওম্ (ॐ) নাম জপ করে হাজার বৎসর ধরে ঘোর তপ করেন। এটা হল ব্রহ্মের ভক্তি। এদিকে ব্রহ্ম প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে যে আমি কোন ধরনের সাধনায়, অর্থাৎ বেদে বর্ণিত যজ্ঞের ফলেও নয়, না তো কোন জপের ফলে, না কোন তপস্যার ফলে, কাউকেও কখনো দর্শন দেব না। গীতার ১১ নং অধ্যায়ের ৪৮ নং শ্লোকে বলেছেন হে অর্জুন! তুই আমার যে রূপের দর্শন করেছিস, অর্থাৎ আমার যে কাল রূপ দেখেছিস, এটাই আমার আসল স্বরূপ। আমার এই রূপকে না বেদে বর্ণিত কোন বিধিতে দেখা যাবে, না কোনো জপ দ্বারা, না কোনো তপস্যা দ্বারা, না কোনো যজ্ঞ দ্বারা না অন্য কোনো ক্রিয়া দ্বারা দেখা যাবে। আমি কৃপা করে তোকে দেখিয়েছি। গীতা জ্ঞান দাতা গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ২৪-২৫ নং শ্লোকে স্পষ্ট করে বলেছেন, এটা আমার অবিনাশী বিধান আছে যে, আমি কখনো কাউকে দর্শন দিই না, আমি আমার যোগমায়া দ্বারা লুকিয়ে থাকি। এই মুর্খ জনসমুদায় আমাকে মনুষ্য রূপে অথাৎ কৃষ্ণ রূপে আসা মনুষ্য মনে করছে। সামনে যে সেনাবাহিনী দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দিকে ইঙ্গিত করে গীতা জ্ঞান দাতা একথা বলেছিলেন। বলার অভিপ্রায় হলো, আমি কখনো কাউকে দর্শন দিই না, এখন তোর উপর অনুগ্রহ করে নিজের আসল রূপ দেখিয়েছি।

ভাবার্থ :- বেদে বর্ণিত বিধিতে বা অন্য প্রকারের প্রচলিত ক্রিয়া কর্মতে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় না। তাই চুনক ঋষিরও ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় নাই, কিন্তু কিছু সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়ে গিয়েছিল। ঋষিগণ এই সিদ্ধি প্রাপ্ত করাকেই সাধনার অন্তিম উপলব্ধি মনে করতো। যার কাছে যত বেশি সিদ্ধি শক্তি থাকতো, তাকে তত বেশী অন্য ঋষিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হতো। চুনক ঋষিও এই উপলব্ধিই প্রাপ্ত করেছিল।

এক সময় মান্ধাতা নামে এক চক্রবর্তী (যার শাসন ক্ষমতা সমস্ত বিশ্বে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে, এমন শক্তিশালী) সম্রাট ছিলেন। তার কাছে ৭২ অক্ষৌহিণী সেনা ছিল। মান্ধাতা সম্রাট তার অধীনস্থ সমস্ত রাজাদের কাছে ঘোষণা করে দেয় যে, যারা আমার অধীনতা স্বীকার করবে না, তাদেরকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। একটি ঘোড়াকে গলায় পত্র বেঁধে ছেড়ে দেয় আর পত্রে লিখে দেয় যে, যদি কোন রাজা মহারাজ মান্ধাতার অধীনতা স্বীকার না করেন, তো তিনি এই ঘোড়া বেঁধে রাখুন আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন। পুরো পৃথিবীতে কেউ সম্রাটের ঘোড়া ধরলো না। ঘোড়ার সঙ্গে কিছু সৈন্যও ছিল। ঘোড়ার ফিরে আসার সময় চুণক ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গিয়েছিলে সৈনিকগণ! উত্তর পেলো যে পুরো পৃথিবীতে ঘুরে এসেছে, কেউ ঘোড়া ধরে নি। কেউ সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস দেখায়নি। চুনক ঋষি বললেন, আমি সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ স্বীকার করে নিচ্ছি। সৈনিকগণ তখন উপহাস করে বলে, আরে কাঙ্গাল! তোর কাছে খাবার দানাও নেই, আর তুই যুদ্ধ করতে চাস সম্রাট মান্ধাতার সঙ্গে? চুণক ঋষি ঘোড়াটা ধরে একটা বৃক্ষে বেঁধে দেন। যখন এই কথা সম্রাট মান্ধাতার কানে গেলো, তখন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দিলেন। সম্রাট তার ৭২ অক্ষৌহিণী সেনাবাহিনীকে চার ভাগে ভাগ করে নিলেন। ঋষির উপর আক্রমণ করার জন্য এক ভাগ ১৮ অক্ষৌহিণী (১৮ কোটি) সেনা পাঠিয়ে দিলেন। অন্য দিকে মহর্ষি চুনক নিজের সিদ্ধির সাহায্যে চারটি পুতুল (পারমাণবিক বোমের মতো) তৈরী করলেন। প্রথমে একটি পুতুল ছেড়ে দিলেন যা সম্রাটের ১৮ কোটি সেনা বিনাশ করে দিল। সম্রাট দ্বিতীয় ভাগ সেনাকে পাঠালেন। ঋষিও দ্বিতীয় পুতুল ছেড়ে দিলেন, যেটা আবার ১৮ অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করে দিল। এইভাবে চুনক ঋষি চারটে সিদ্ধির পুতুল দিয়ে, মান্ধাতা সম্রাটের ৭২ অক্ষৌহিনী সেনা নষ্ট করে দিলেন। যে ঘটনার কারণে সমস্ত পৃথিবীতে চুনক ঋষির মহিমার গুনগান করা শুরু হয়ে যায়।

এই অঘটন (অনর্থ) - ঘটানোর জন্য চুনক ঋষিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি বলা হয়।

হে ধর্মদাস! (জিন্দা রূপধারী পরমাত্মা বলছেন) এত যে সেনা চুনক ঋষি হত্যা করলেন, এই পাপ কর্ম ঋষির সঞ্চিত কর্মফলের খাতায় জমা হয়ে গেল। চুনক ঋষি যে ওম্ (ॐ) এক অক্ষর মন্ত্রের জপ করে ছিল, তার প্রতিফলে সে ব্রহ্মলোকে যাবে। তারপর ব্রহ্মলোকে নিজের প্রাপ্য সুখ ভোগ করে এই পৃথিবী লোকে আবার জন্ম নেবে। যে হঠ যোগ সাধনা করেছিল, তার প্রতিফল হিসাবে পৃথিবী লোকে রাজা হবে। তার মৃত্যুর পরে কুকুর হয়ে জন্ম নেবে, তখন যে ৭২ কোটি সেনাদের মেরেছিল, সেই সেনারা প্রত্যেকে তাদের নিজেদের প্রতিশোধ নেবে। কুকুর হয়ে তার মাথায় ঘা হবে ওই ঘায়ে পোকা হয়ে ৭২ অক্ষৌহিণী সেনারা নিজেদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। হে ধর্মদাস! এই জন্য গীতা জ্ঞান দাতা (কালব্রহ্ম) গীতাতে তার নিজের সাধনায় হওয়া গতিকে বা মুক্তিকে অনুত্তম্ (খারাপ) বলেছেন।

॥ মুখের ক্যান্সার রোগ সম্পূর্ণ সেরে যাওয়া ॥

আমি ভক্ত অশোক কুমার সিন্হা, পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার, রিষড়া এলাকাতে থাকি, বাড়ির ঠিকানা 24-A, এস. ডি. মুখার্জি লেন 712248, রিষড়া।

কৈশোর অবস্থা থেকেই ভক্তির দিকে আমার একটা বিশেষ টান বরাবরই ছিল। পারম্পরিক দুর্গা মাতার পূজা, হনুমান পূজা ছাড়াও বিশেষ করে সাঁইবাবার ভক্তি পুজাও করতাম। বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র, ধাম যাত্রা এবং সঙ্গে অন্যান্য দান ধর্ম ক্রিয়াকর্ম গুলোও করতে থাকতাম।

তখন আমার বয়স ছিল ৪২ বছর, একদিন হঠাৎ করে সামান্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলাম। ডাক্তারবাবু আমাকে ভালো করে দেখে শুনে অনেকগুলো টেস্ট এবং চেক আপ করাতে বলেছিলেন। সেই সব রিপোর্টগুলো চেক করে ডাক্তাররা আমাকে বলেন যে, আমি ওরাল ক্যাভিটি ক্যান্সারে আক্রান্ত। খবরটা শুনতেই আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল, আর আমার জীবন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে ভরে গেল। জীবনের কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে, ভগবানের প্রতি আমার যে একটা বিশ্বাস ছিল সেটা হারিয়ে যেতে শুরু করলো।

যাইহোক, এরপর আমি চিকিৎসার জন্য মুম্বাইয়ে যাই, সেখানে এক হসপিটালে ১৮-দিন ভর্তি ছিলাম। অপারেশনের জন্য আমাকে অপারেশনের পোশাক পরিয়ে রাখা হত এবং অত্যন্ত কম খাবার খেতে দেওয়া হত।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন সাঁই বাবা এক অন্য সাধুবেশে আমাকে স্বপ্নে দর্শন দেন, তখন আমি ওনার কাছে প্রার্থনা করছিলাম আমার ক্যান্সার ঠিক করে দেওয়ার জন্য, কিন্তু উনি আমাকে সুস্থ করার পরিবর্তে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে চান। তখন আমি টাকা না নিয়ে, একটাই কথা বলি যে, আমি টাকা চাই না কেবল আমি সুস্থ হতে চাই, আপনি আমাকে সুস্থ করে দিন।

সুস্থ হওয়া তো দূরের কথা বরং আমি আরো অসুস্থ হয়ে পড়ি, ক্যান্সারের অপারেশনে, ডাক্তারদের আমার খাদ্যনালীর কিছু অংশ কেটে বাদ দিতে হয়, আর আমাকে বলে দেয় যে, তুমি জীবনে কখনো মুখ দিয়ে খাবার খেতে পারবে না তাছাড়া লবণ, ঝাল, মসলা এগুলো কখনোই খেতে পারবে না। তখন আমাকে নাকের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে নল ঢুকিয়ে কেবল জুস খাওয়ানো হতো। অসহ্য কষ্টের মধ্যে দিয়ে

এইভাবে দিনগুলো কাটছিল। যাঁদের ভগবান বলে মনে করতাম তাঁরাও যখন কিছু করতে পারলেন না তখন ভগবানের প্রতি আমার যে অল্প আস্থা ছিল সেটাও হারিয়ে গেলো।

একদিন আমার এক নিকট পরিচিত বন্ধু (ভক্ত দিলীপ রজক দাস) আমার এই শোচনীয় অবস্থার কথা জানতে পারেন, এবং তিনি আমাকে পরম সন্ত রামপালজী মহারাজের অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে বলেন। জ্ঞানটা আরো জানার জন্য আমি সর্বপ্রথম সন্ত রামপালজী মহারাজ দ্বারা লিখিত জ্ঞানগঙ্গা পুস্তক কিছুদিন যাবৎ পড়তে থাকি, জ্ঞানটা বুঝতে পারার পর বরবালা গিয়ে আশ্রম থেকে ২০১৪ সালে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করে আমি এবং আমার স্ত্রী নিয়মানুসারে ভক্তি করতে থাকি। নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করার এক মাসের মধ্যেই গুরুজীর আশীর্বাদে আমার ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। আমি পূর্বের ন্যায় চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া সবকিছুই করতে থাকি। সবচেয়ে বড় কথা যেখানে ডাক্তাররা আমাকে বলে দিয়েছিল যে, আমি কখনো মুখ দিয়ে খেতে পারব না এবং আমার খাদ্যনালীর অংশ কাটা ছিল, সেখানে গুরুজির আশীর্বাদে আমার খাদ্যনালী পুনরায় জুড়ে পুরো হয়ে যায়। আজ আমি সমস্ত প্রকারের খাবার, লবণ ঝাল, মসলাদার খাবার নির্দ্বিধায় খেতে পারি। গুরুজি সৎসঙ্গে বলেন :-

সতগুরু জো চাহে সো করহী। চৌদো কোটি দূত জম ডরহী॥
উত ভূত যম ত্রাস নিবারে। চিত্রগুপ্ত কে কাগজ ফারে॥

অর্থাৎ সৎগুরু যা চান তাই করতে পারেন, এমনকি চিত্রগুপ্তের কাগজও ছিঁড়ে ফেলে নিজের ভক্তের আয়ু বাড়িয়ে নতুন করে লিখতে পারেন।

এছাড়াও আমার আর্থিক স্থিতি আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একবার আমার স্ত্রী চলন্ত বাইক থেকে পড়ে যায়, এবং মাথায় গভীর ভাবে চোট এসে যায়, প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওনাকে ব্রেনের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে, ডাক্তার বাবু বলেন, ইনি বেঁচে আছেন কি ভাবে! "আমি এই পেশেন্ট-কে দেখবো না, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ইনি মারা যাবেন। আমি সতগুরুজীর কাছে প্রার্থনা করি, আর স্ত্রী-কে নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে আসি। ডাক্তার যা ওষুধ দিয়েছিল, তা সব আমি ড্রেনে ফেলে দিই, আর গুরুজীর বলা মতো দৃঢ় ভাবে ভক্তি করতে থাকি। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমার স্ত্রী এবং আমাকে কখনো রোগের কারণে ওষুধ খেতে হয়নি এবং আমার ঘর পরিবার নিয়ে আমি খুব সুখে শান্তিতে পরমাত্মার ভক্তি, সেবা করে জীবন যাপন করছি।

তাই যে সকল পাঠকগণ পরমাত্মার এই সব লীলা, মহিমা শুনছেন, তাদের সকলের কাছে আমার সবিনয়ে নিবেদন, আপনারা অবশ্যই সন্ত রামপালজী মহারাজের লেখা অদ্ভুত অদ্বিতীয় জ্ঞান গঙ্গা পুস্তক পড়ুন, এবং সত্য জ্ঞান বুঝে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করে নিজের কল্যাণ সাধন করান।

অশোক কুমার সিনহা, 24-A, এস. ডি. মুখার্জি লেন, রিষড়া, হুগলি, 712248

সত সাহেব

॥ ভয়ংকর দুঃখ পরমসুখে বদলে গেল ॥

আমি ভক্তমতি পুতুলি দাসী, স্বামী নিশি দাস। আমার বাড়ি মালদা জেলার, ভগবানপুর গ্রামে। সৎগুরুদেব রামপালজী মহারাজের শরণে আসার আগে, আমার জীবনে দুঃখের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল। সেই দুঃখের কাহিনী, এখানে সংক্ষেপে কিছুটা বলার চেষ্টা করবো মাত্র।

আমার বয়স ছিল মাত্র আট বছর, আমার বাবা হঠাৎ করে মারা যান। আমি তখন স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ি, বাবার এই হঠাৎ চলে যাওয়াতে আমাদের পরিবারে বিশাল একটা শূন্যস্থান তৈরী হয়। মানসিক, আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, মায়ের অবস্থা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। অন্যদিকে আমরা তিন জন বোন ভাই, আমার এক ছোট ভাই আর এক বড় দিদি মিলে, সবাই তখনও বেশ ছোটই ছিলাম। ভাই আর দিদি তো প্রায় সময় কাঁদতেই থাকতো, দুবেলা খাবারটাও আমাদের ঠিক মতো করে জুটতো না। এই অবস্থায় কাউকে না কাউকে তো পরিবারের হালটা ধরতেই হতো। সেই সময় একদিন আমার স্কুলের এক ম্যাডাম নিজের বাড়ির এক রুগীর দেখাশোনার জন্য কাজের আয়া খুঁজছিলো। আর আমি তখন সেই কাজ করবো বলে ম্যাডামকে অনুরোধ করি, উনি আমাকে বলেছিলেন, যে তুমি এতো ছোট্ট আছো, তুমি কি কাজ করতে পারবে? আমি নির্দ্বিধায় হ্যাঁ বলে দিই। তখন আমার গায়ে পড়ার মতো পোশাক টুকুও ঠিক ছিল না, ম্যাডাম আমাকে আগে ঠিক মত জামাকাপড় কিনে পরিয়ে দেন, তারপর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান এবং আমাকে আমার কাজ বুঝিয়ে দেন। আর সেই তখন থেকেই আমি কাজ করে বাড়িতে টাকা পাঠাতে শুরু করি।

এইভাবে বছর চার পার হয়ে যায়, তখন আমার বয়স মাত্র ১২ বছর, আমার কাকা, জ্যাঠারা মিলে আমাকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। আমার স্বামীর মারাত্বক মদের নেশা ছিল। বিয়ের পর থেকে এমন একটা দিনও কাটেনি, যেদিন আমার স্বামী নেশা করেনি, তার জন্য অভাব, দুঃখকষ্ট আর প্রতিদিন ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকতো। এরপর এক এক করে আমার দুই মেয়ের জন্ম হয়। এই ভাবে যখন আমাদের সংসার ডামাডোলে চলছিল, ধীরে ধীরে আমার স্বামীর মধ্যে, এক অজানা রোগ শুরু হল, যাতে শরীরের চামড়া ফেটে ফেটে রক্ত বার হতে থাকে, উনি অত্যন্ত দুঃখী ও পীড়িত হয়ে পড়েন। রোগের জ্বালায় হঠাৎ একদিন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। আমার স্বামীর এই ভাবে মৃত্যুতে, তার পরিবার আর পাড়া প্রতিবেশীরা আমাকে অপবাদ দিতে থাকলো যে, আমিই আমার স্বামীকে খেয়েছি। এই জ্বালায় আমাকে, দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ত্যাগ করতে হয়, কোলে ছ-মাসের মেয়ে সহ দুই সন্তানকে নিয়ে মায়ের কাছে চলে আসি। এদিকে মায়ের অবস্থাও, বাবার মৃত্যুর পর থেকেই সেখানে খুবই খারাপ পরিস্থিতি চলছিল। তাই সেখানেও আমার বেশিদিন ঠাঁই হয় নি। মৃত্যুই একমাত্র পথ বলে মনে হয়েছিল। তবুও দুই সন্তানের কথা মাথায় রেখে, অন্য কোন রাস্তা চোখের সামনে না দেখতে পেয়ে আবার সেই পুরোনো স্কুলের ম্যাডামকে ফোন করি, যেখানে আমি আগে কাজ করতাম। নিজের সমস্ত ঘটনাটাকে ম্যাডামকে জানাই, এবং তারপর বলি যে, আপনি আমাকে না সামলালে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় থাকবে না। তখন ম্যাডাম বললেন তুমি অটো ধরে আমার বাড়িতে চলে এসো। সেইমতো আমি আবার পুরোনো ম্যাডামের বাড়িতে কাজ করা আরম্ভ করি, আর বড় মেয়েকে দিদির কাছে রেখে তার খরচ খরচা পাঠিয়ে দিতে থাকি।

যা রোজগার করতাম তার বেশির ভাগটাই দিদিকে পাঠিয়ে দিতাম। আর দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে থাকার জন্য ছোট মেয়েটাকে ঠিক মতো দেখতে পারতাম না, যার কারণে একদিন ছোট মেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে ঠিকমত চিকিৎসা না করালেও নয়, একদিকে ভয় আমার মেয়েটার রোগটা যেন বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়, আরও একটা ব্যাপার মাথায় ছিল যে, যদি সেরকম কিছু হয়ে যায় তো আবার শ্বশুর বাড়ির লোকজন বলবে আগে স্বামীকে খেয়েছে, এখন মেয়েটাকেও খেয়ে ফেলেছে। তাই ম্যাডামের কাছে ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে মেয়েকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়াতে থাকি। অনেক ওষুধ পত্র করে বহু চিকিৎসার পর মেয়ে সুস্থ হয়। ইতিমধ্যে অন্য আর এক ম্যাডামের সাথে আমার পরিচয়

হয়, তিনি আমাকে দুঃখী দেখে বলেন, তুমি বোম্বাই চলে যাও, সেখানে গিয়ে ভালো কাজ করে বাড়িতে পয়সা পাঠাও এবং নিজেও সুখে থাকো। সেইমতো আমি বাড়িতে না জানিয়ে দুই মেয়েকে এখানে মায়ের কাছে ছেড়ে বোম্বাই চলে যাই। সেখানে এক ম্যাডামের বাড়িতে ঘরের কাজকর্ম করতে থাকি। প্রথম মাসের বেতন ৯০০০ টাকা পাই, প্রায় পুরোটাই বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। এত টাকা বাড়িতে পাঠিয়েছি বলে নিজের মা আমাকে বলে যে, তুই ওখানে নিশ্চয়ই কোন খারাপ কাজ করছিস। মায়ের কথায় কষ্ট পেয়ে সেদিন আমি অনেক কেঁদেছিলাম। তারপর থেকে বাড়িতে টাকা পাঠানো একটু কম করে দিই, তখন আবার মা বলে এত কম টাকা পাঠাচ্ছিস কেন, বেশি করে টাকা পাঠা। যাই হোক এই হল সংসারের রীতি। এইভাবে বেশ কিছুদিন কাটার পর হঠাৎ করে একদিন আমার মা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, আমি জানি না তখন আমি কি করবো, কোথায় যাব! বাড়িতে ছোট ছোট দুটো মেয়ে আছে, মায়ের কিছু হয়ে গেলে ওদের কে দেখবে! আমি অত্যন্ত দুঃখী আর হয়রান হয়ে যাই। ছোটবেলা থেকেই গোপালকে (শ্রীকৃষ্ণকে) নিজের ঈস্টদেব বলে, ভক্তি পূজা করে আসছি, তবুও আমার জীবনে দুঃখের পর দুঃখ আসতেই থাকছে। কিছুতেই কিছু বুঝতে পারছিলাম না, যে কেনো এমন হয়? আর যদি ভগবান তুমি সত্যিই থাকো, আর যদি তোমার এত ভক্তি পূজোও করি, তবুও কেন আমার এত কষ্ট? আমার সাথে এগুলো কি হচ্ছে ভগবান? প্রতিটা রাত আমাকে কেঁদে কেঁদে কাটাতে হতো, যে কেউ আমাকে দেখতো, সে প্রশ্ন করত আমি কেন এত দুঃখে থাকি? আমি নিজে তখন এর উত্তর পাইনি আর ভগবানও আমাকে সারা দেয়নি।

তারপর একদিন হঠাৎ সকালবেলাতে আমি রুটি বানাচ্ছিলাম, পাশে মোবাইলটা রাখা ছিল, হঠাৎ করে একটা অদ্ভুত চমৎকার হয়, আমার ফোনে অটোমেটিক ভাবে সন্ত রামপালজী মহারাজের সৎসঙ্গ চালু হয়ে যায়। প্রথমে গিয়ে আমি বন্ধ করে দিই, কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয়বার আবার ওই সৎসঙ্গ চালু হয়। এবার আমি তাড়াতাড়ি রুটি বানানো সেরে নিয়ে সৎসঙ্গে গুরুজী কি বলছেন, সেটা শুনতে লাগলাম আর বুঝতে পারলাম, কে সেই পরম ভগবান। সেই ভিডিওতে সন্ত রামপালজী মহারাজ সংসাররূপী উল্টো ভাবে থাকা অবিনাশী অশ্বত্থ বৃক্ষের বর্ণনা করছিলেন। আর বলছিলেন, "যিনি এই বৃক্ষের প্রতিটা বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন তিনি হলেন প্রকৃত গুরু অর্থাৎ গোবিন্দও তিনিই।"

ওনার এই কথাগুলো আমার মনে গভীর দাগ কেটে যায় এবং মহারাজের স্বরূপ দেখেই আমি আকৃষ্ট হয়ে যাই আর ওনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বিচলিত হয়ে পড়ি। যেহেতু এই ঘটনাটি লকডাউন চলাকালীন সময়ে হয়েছিল সেই কারণে আমি বাইরে বার হতে পারছিলাম না, তাই কোন উপায় না দেখে আমার মোবাইলে যত কন্টাক্ট নাম্বার ছিল সবাইকে আমি এক এক করে কল করে, সন্ত রামপালজী মহারাজ এর বিষয়ে জানার চেষ্টা করতে থাকি। কিন্তু কেউই গুরুজীর বিষয়ে কিছু বলতে পারেনি। অবশেষে আমার মোবাইলে যখন শেষ একটা মাত্র কন্টাক্ট নাম্বার আর কল করতে বাকি রয়ে গেছে, যাকে ফোন করতেও দ্বিধা করছিলাম কারণ সেই ব্যক্তির বিষয়ে আমি কর্মসূত্রে তাকে জানতাম যে, তিনি দেবী দেবতার ভক্তি করেন না, কোন প্রসাদ খান না, এবং আমি তাঁকে ঠিক এই কারণেই পছন্দ করতাম না, যে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ পরমাত্মা বলে মানতেন না। যাই হোক কোন উপায় না দেখে তাকেই যখন ফোন করলাম, এবং আমার সাথে ঘটা অদ্ভুত চমৎকারের বিষয়ে ওনাকে বললাম, সেই সাথে গুরুজীর ভিডিও ক্লিপের বিষয়ে যখন বলি। তখন সেই ব্যক্তি আমাকে বলেন যে, "আপনি এখন কি করতে চান"। আমি তাঁকে বলি যে আমি এই গুরুজীর কাছে যেতে চাই, ওনাকে দেখতে চাই। আমার কথা শুনে সেই ব্যক্তি আমাকে বলেন যে, আপনি তো আমার গুরুজীর কথা বলছেন। ওনার

মুখে এই আমার গুরুজী কথাটা শুনে আমি এতটা খুশি হয়ে যাই এবং চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করি, যেন আমি ভগবানের খোঁজ পেয়ে গেছি। তারপর সেই ব্যক্তির থেকে মালদা নামদান সেন্টারের নম্বর নিয়ে সেন্টারে কল করি, এবং যথারীতি ওইদিনই দুপুর বেলা একটার সময় অনলাইনে আমার নাম দীক্ষা সম্পন্ন হয়। নাম দীক্ষা নেওয়ার পর আমি প্রদীপ জ্বালতে পারতাম না যেহেতু আমি অন্য ব্যক্তির বাড়িতে কাজের জন্য থাকি তাই। তখন সতগুরুদেবজীর কাছে অনেক কাঁদতাম। নাম দীক্ষা নেওয়ার তিনদিন পর সতগুরুদেব রামপালজী মহারাজ আমাকে দর্শন দেন, এবং আমার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। তারপর পরমাত্মার দয়ায় আমি প্রদীপ জ্বালাতে শুরু করি, কিছুদিন ভক্তি করার পর আমার দীর্ঘদিনের এলার্জি রোগ সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। বাড়িতে আমার অসুস্থ মা অনেকটা সুস্থ হয়ে যায়। আমি জীবনে বাঁচার একটা নতুন রাস্তা খুঁজে পাই। আমি যে বাড়িতে কাজ করতাম, সেখান থেকে আমার ভক্তি করতে বেশ সমস্যা হচ্ছিল, কারণ একদিন আমি খাওয়ার জন্য ফ্রিজ খুলে দেখি তার মধ্যে মদের বোতল রাখা ছিল, তাই দেখে আমি ম্যাডামকে বলি যে, ম্যাডাম আমি তো ভক্তি করি আর এইভাবে ফ্রিজে নেশার জিনিস থাকলে আমি খাবার কিভাবে খাব? সেই কথা শুনে ম্যাডাম অত্যন্ত রেগে যায় এবং আমাকে একপ্রকার সেখান থেকে তাড়িয়েই দেয়, হঠাৎ করে কাজটা চলে যাওয়াতে আমার অনেকটা দুঃখ হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মার এত দয়া হল, যে কাজ চলে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এক ভক্ত ভাইয়ের বাড়িতে আমি নতুন করে কাজ পেয়ে যাই। বর্তমানে আমি সেখানেই থাকি, পরমাত্মা নিজ দাসীকে খুব সুখে রেখেছেন, যে বাড়িতে আমি কাজ করি, তাদের সাথেই আমি প্রতি রবিবার সৎসঙ্গে যাই, পুস্তক সেবায় যাই এবং ভক্তি, সেবা, নামজপে আমার কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। আজ পূর্ণ পরমাত্মা স্বরূপ আমার গুরুজী আমাকে সর্ব সুখ এবং মোক্ষ প্রাপ্তির সঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন।

আমি জানি আমার মত দুঃখী মানুষ এই সংসারে অনেক আছে, তাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা একবার সন্ত রামপালজী মহারাজের সৎসঙ্গ শুনুন অথবা "জ্ঞান গঙ্গা" "জীবনের পথ" পুস্তক পড়ুন। আজ পূর্ণ পরমাত্মা স্বয়ং পৃথিবীতে অবতার রূপে এসেছেন, ওনাকে চিনুন এবং সৎভক্তি করে সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত করুন। গুরুজী একটি বাণী বলেন :-

ঈস সন্সার সামাঝদা নাহীঁ,ক্যাহেন্দা শাম দো পেহেরু নু।
গরীব দাস, ইয়ে বক্ত জাত হ্যাঁয় রোবোগে ঈস পেহেরু নু॥

আজ এই সংসার বুঝতে পারছে না যে, অসংখ্য যুগ ধরে জন্ম মৃত্যুর মাধ্যমে এই দুঃখ কষ্টে ভরা জীবন ব্যতীত করার পর সতগুরু প্রাপ্তির আর তার সঙ্গ সমীপে থেকে সৎভক্তি করে মোক্ষ লাভ করার এই সুযোগ ঘটেছে। আর এই ভয়ঙ্কর কালের লোকে মানব জীবনের এই অমূল্য সময়টা সৎভক্তি বিনা কিভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর পর এই সময় সুযোগের কথা চিন্তা করে, কান্না ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। আপনারা সতগুরু রামপালজী মহারাজের শরনে আসুন এবং নিজের আত্মকল্যাণ করান।

পুতুলি দাসী, স্বামী: নিশি দাস, গ্রাম: ভগবানপুর, জেলা: মালদা

সত সাহেব

॥ সদগুরুদেবের অসীম কৃপায় ব্রেন টিউমার বিনা অপারেশনে সম্পূর্ণ সেরে গেছে॥

ডাক্তাররা আমার সিটি স্ক্যান করায় এবং রিপোর্টে ব্রেন টিউমার ধরা পড়ে। যখন আমার জ্ঞান ফেরে

তখন আমি দেখি আমি একটা নার্সিংহোমে ভর্তি আছি। এই ঘটনা গুলির কথা আমি জ্ঞান ফেরার পরে নিজের ছেলের মুখেই শুনি। কিছুদিন পর কিছু ওষুধপত্র দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার পরে ওই নার্সিংহোম থেকে আমাকে ব্রেন টিউমার অপারেশন করানোর জন্য ব্যাঙ্গালোরে রেফার করে দেওয়া হয় এবং অপরেশনের খরচও প্রায় ছয় লক্ষ টাকা হতে পারে বলে জানিয়ে দেয়, কারণ ব্রেন টিউমারটি খুবই সেনসিটিভ জায়গায় হয়েছিল, প্রাণঘাতের আশঙ্কা ছিল, তাই ওরা নিজেরা রিস্ক নিতে চায়নি।

এরপর আমার পরিবারের লোকজন আমাকে ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কিছুদিন এডমিট থাকার পরও চিকিৎসকরা আমার কেসটাতে ঠিকমতো ধ্যান দিচ্ছিলেন না, অন্যান্য ইমারজেন্সি রোগীদের নিয়ে তারা ব্যস্ত ছিলেন। যখন আমার অপারেশনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তারা বলে দেয় ছয় মাস পরে নিয়ে আসতে। ডাক্তারদের কথা মতো আমাকে ওষুধপত্র দিয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয়, আর ঠিক তার পরেই করোনার জন্য লকডাউন লেগে যায়। ছমাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও লকডাউনের কারণে প্লেন বা ট্রেন কিছুই চলছিল না, আর যে কারনে চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্গালোরে যেতে পারছিলাম না, এদিকে প্রয়োজনীয় ওষুধও শেষ হয়ে গিয়েছিল, শরীর আরো বেশি খারাপ হতে লাগলো, হাঁটাচলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল, তারপর অ্যাম্বুলেন্সে করে জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতার এস এস কে এম হসপিটালে আনা হল। এস এস কে এম হসপিটালে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিছুদিন ভর্তি রাখা হল। এমতাবস্থায় আমাকে যে মহিলা ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল, সেখানকার তিন-চারজনের করোনা পজিটিভ হয়ে যায়। তারপর আমারও পরীক্ষা করা হয় এবং আমিও করোনা পজিটিভ হয়ে যাই। তখন আমাকে এসএসকেএম হসপিটাল থেকে রেফার করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে অর্থাৎ করোনা হসপিটালে পাঠানো হয়, সেখানে বিনা চিকিৎসায় একরকম মরণাপন্ন অবস্থা হয়ে যায়, তখন আমি বাড়ির লোককে ফোন করে কান্না-কাটি করে বলি যে, হসপিটালে মরার থেকে নিজের বাড়িতে গিয়ে মরা অনেক ভালো কারণ প্রিয় জনদের পাশে দেখতে পাবো। তোমরা আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো। তারপর আমার পরিবারের লোকজন আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলে আসে।

এভাবে কিছুদিন কাটার পর একদিন আমার স্বামী বাজারে চলতে থাকা পুস্তক প্রচার সেবা থেকে জ্ঞানগঙ্গা বই নিয়ে এসে আমাকে পড়তে দেয়, ওই বইটা আমি তিন দিনেই পড়ে কমপ্লিট করি, এবং বইটা পড়ার পরে নিজের মধ্যে নতুন করে বাঁচবার জন্য একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করি এবং ছোট বেলা থেকে অজানা এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর আমি জানতে পারি, বিশেষ করে মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয়ে, তারপর জ্ঞান গঙ্গা পুস্তকে থাকা সন্ত রামপালজী মহারাজের ফটোটা আমি ল্যামিনেশন করে তার সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিজের মত করে ভক্তি করা শুরু করে দিই, আর তাতেই আমার বাম হাত যেটা অকেজো অচল হয়ে পড়েছিল, তা আবার আগের মতো সচল হয়ে যায়। আমার বিশ্বাস তখন অনেক দৃঢ় হয়ে যায়, আর আমি পাগলের মত চেষ্টা করছিলাম কিভাবে সন্ত রামপালজী মহারাজের থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে ভক্তি করা যায়। এরপর অনেক বাধা অতিক্রম করে পুস্তকে থাকা নম্বরে ফোন করে নিকটবর্তী শিলিগুড়ি নামদান সেন্টার থেকে নাম দীক্ষা প্রাপ্ত করি, তারপর গুরুদেবের বলা নিয়ম-মর্যদাতে থেকে ভক্তি করার প্রায় এক মাসের মধ্যেই আমার ব্রেন টিউমার সম্পূর্ণ সেরে যায়, এবং আমি নিজে থেকে চলাফেরা করা, সৎসঙ্গে যাওয়া, পুস্তক সেবায় যাওয়া সবকিছুই করতে শুরু করে দিই। এগুলোর সাথে সাথে প্রতিদিন পরমাত্মার কৃপায় আমার সাথে আরো অনেক চমৎকার তো ঘটতেই থাকে, সর্বোপরি সদগুরুদেবজীর অসীম দয়ায় আমি শাস্ত্র নির্দেশিত সঠিক ভক্তিবিধি এবং মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য

মোক্ষ প্রাপ্তির মার্গ তো পেয়েই গেছি।

জগতের সমস্ত ভাই বোনদের কাছে আমার বিশেষ নিবেদন, আপনারা কৃপা করে সন্ত রামপালজী মহারাজ এর দ্বারা লিখিত "জ্ঞান গঙ্গা" অথবা "জীবনের পথ"- পুস্তক SMS করে ডাকযোগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বা প্রচার সেবা থেকে স্বল্প মূল্যে প্রাপ্ত করে অবশ্যই পড়ুন এবং সন্ত রামপালজী মহারাজের কাছে থেকে নাম দীক্ষা নিয়ে, নিজের মানব জীবনকে সফল করুন।

পূর্ণিমা সরকার, স্বামীর নাম: বরেন সরকার, গ্রাম: আমবাড়ি, জেলা: জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

সত সাহেব

॥ আমার স্বামী পরমাত্মার দয়াতে সম্পূর্ণ নেশা মুক্ত হয়ে যায়॥

আমি ভক্তমতি আমা দাসী, আমার স্বামী ভক্ত রাজারাম দাস এবং আমার ৫-টি কন্যা সন্তান আছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার, বর্ধমান সদর থানার অন্তর্গত আজির বাগান এলাকায় মাটিবাগ গ্রামের বাসিন্দা।

সদগুরু রামপালজী মহারাজের শরণে আসার পূর্বে আমার জীবনটা একদম নরকে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং আমি অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। তার মুখ্য কারণ, আমার স্বামীর ভয়ংকর মদ্যপানের নেশা ছিল। কখনো কখনো তো উনি মদ খেয়ে নেশায় চূর হয়ে রাস্তাতেই পড়ে থাকতেন। পরিবারের দায় দায়িত্ব গুলো ত্যাগ করেন, আমাদের প্রতি একটুও নজর দিতেন না। আর ওই নেশার কারণেই পরিবারে মারাত্মক আর্থিক অভাব অনটন দেখা দেয়। খাবার জন্য সমস্যা হয়ে যায়, এমনকি বাচ্চারা সময়ে ঠিকমত খাবারও পেত না। নেশা করে বাড়িতে এলেই মারপিট ঝগড়া ঝাঁটি শুরু হয়ে যেত আর এরকমটা প্রায় লেগেই থাকতো। আমিও পাঁচটি বাচ্চাকে সামলাতে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখী ও অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। আর এইসব কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে আমি অনেক দেবী-দেবতাদের, হনুমানের পূজা অর্চনা, দুর্গা মায়ের নবরাত্রি ব্রত পালন এই সবকিছুই করে দেখেছি, কিন্তু কোনো কিছুতেই কোন লাভ হয়নি।

আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য, আমি নিজে কিছু রোজগার করার উদ্দেশে একটি সেলাই মেশিন কেনার জন্য স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করি, স্বামী রাজি হয়ে যায়। যখন আমরা সেলাই মেশিন কেনার উদ্দেশ্যে বাজারে যাই, তখন সেখানে আমার স্বামী সেলাই মেশিনের পরিবর্তে হঠাৎ করে সেই টাকায় একটা মোবাইল কিনে নেয়। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত দুঃখী হয়ে গিয়েছিলাম। একদিন আমি যখন ওই মোবাইলটা চালাতে যাই, তখন মেসেঞ্জারে সদগুরুদেব রামপালজী মহারাজের কিছু সৎসঙ্গের লিংক খুলে যায়, আমি ওই সৎসঙ্গগুলো শুনতে থাকি এবং খুব ভালো লাগতে শুরু করে। এরপর বিভিন্ন বাহানায় মোবাইল নিয়ে আমি সৎসঙ্গ শুনতাম, এবং সেখানে বিভিন্ন ভক্তের আত্মকথাও শুনতাম। জ্ঞানটা বোঝার পর একদিন নাম দীক্ষা নেওয়ার জন্য মনস্থির করি, সৎসঙ্গের নিচে চলা স্ক্রল লাইন থেকে নম্বর নিয়ে আশ্রমে ফোন করি, তখন নিকটবর্তী নামদান সেন্টার থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করা হয়। নাম দীক্ষার জন্য আমাকে সেন্টারে আসতে বলা হয়, কিন্তু আমি এতটাই নিঃস্ব ছিলাম যে, সেন্টারে যাওয়ার মতো গাড়ি ভাড়া টুকুও আমার কাছে ছিল না। তাই অনলাইনে নাম দীক্ষা নেবার জন্য তৈরি হয়ে যাই। তারপর পরমাত্মার অসীম দয়ায় আমার অনলাইনে নাম দীক্ষা সম্পন্ন হয় এবং সাথে সাথেই আমাকে নাম দীক্ষার অন্যান্য সামগ্রীও সেবাদার ভক্তদের দ্বারা বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এইভাবে সদগুরুদেবের অসীম কৃপায় পরিবারের মধ্যে প্রথমে আমি নিজে একাই ভক্তি করা শুরু করি। আমার স্বামী অত্যন্ত বিরোধ করতেন এবং ভক্তিতে অনেক বাধা সৃষ্টি করতেন, একদিন তো উনি সদগুরুদেবের ফটোও ছিঁড়ে দিয়েছিলেন, তখন আমি সেই ছেঁড়া ফটো বুকে নিয়ে সারারাত পরমাত্মার জন্য কেঁদেছিলাম আর পরমাত্মার চরণে প্রার্থনা করেছিলাম যে হে! পরমাত্মা, আমার স্বামী যেন আপনার শরণে চলে আসে এবং আপনার আশীর্বাদ ভরা হাত যেন ওর মাথার উপরে সর্বদাই থাকে।

এইভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর যখন একদিন আমি সৎসঙ্গের উদ্দেশ্যে সেন্টারে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ আমার স্বামী আমাকে বলে, "তোমার জন্য কি টোটো গাড়ি দেখবো" আমি না বলে দিই। তারপর আবার উনি বলেন যে "তোমাকে কি কিছু টাকা দেব সৎসঙ্গে যাওয়ার জন্য" এবারেও আমি না বলে দিই। তারপর উনি বলেন "আমি কি তোমার সঙ্গে সেন্টারে যাব, কিন্তু নাম দীক্ষা নিতে বলবে না" তখন আমি উত্তর দিই হ্যাঁ চল, আমি কি তোমাকে বারণ করেছি নাকি! তারপর আমরা সবাই একসাথে দুর্গাপুর নামদান সেন্টারে পৌঁছাই, সেখানে ভান্ডারা সেবা করার জন্য আমি ভাণ্ডারা ঘরে চলে যাই, কিছুক্ষণ সেবার পর, পিছনে ফিরে দেখতে পাই যে আমার স্বামী নাম দীক্ষা নিয়ে নিয়েছে, আমি খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এটা প্রত্যক্ষ সদগুরুদেব পরমাত্মার আশীর্বাদ ছাড়া কখনোই সম্ভবপর ছিল না। পরমাত্মাকে দন্ডবত্ করে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

সেই দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার স্বামী কখনো নেশা করা তো দূরের কথা কোন নেশার দ্রব্যকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।

সদগুরু রামপালজী মহারাজের অসীম কৃপায় আজ আমাদের পুরো পরিবার সুখী। কোন জিনিসের অভাব নেই। আমার পাঁচটি মেয়েও নাম দীক্ষা নিয়ে সতভক্তি করছে। পরমাত্মা আমাদেরকে নতুন জীবন দান দিয়েছেন।

এছাড়াও পরমাত্মা কিছু মাস পূর্বে আমাকে দর্শন দিয়ে আশীর্বাদও করেছেন।

এখন আমরা সপরিবারে পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে, পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশ্যে পরমাত্মার বলা সকল শাস্ত্রবিধি অনুসারে আর মর্যাদা পালন করে সদভক্তি করছি।

তাই আজ যারা এবং যে সমস্ত পরিবার নেশার কবলে পড়ে, এবং যারা এর জন্য আমার মত সর্বহারা নিঃস্ব অসহায় হয়ে পড়েছেন, তাদের কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ নিজের এই অমূল্য মানব জীবনটি নষ্ট করবেন না। আপনারা অনুগ্রহ করে নিজের, পরিবারের এবং সমাজের কল্যাণার্থে জগৎগুরু তত্ত্বদর্শি সন্ত রামপালজী মহারাজের শরণে এসে সতভক্তি করে, নেশামুক্ত হন এবং সঠিক ভক্তি করে মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য মোক্ষ প্রাপ্তি করে মানব জীবনটি সফল করুন।

আমা দাসী, স্বামী: ভক্ত রাজারাম দাস, গ্রাম: মাটিবাগ, আজির বাগান এলাকা, থানা: বর্ধমান সদর থানা, জেলা: বর্ধমান

সত সাহেব